শুকতারা

দুরন্ত 'তপাই'কে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন : ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Editing - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved
by Dhulokhela Team
for Reading Purpose only

Anyone can contribute a little to our Project
by giving their valuable rare magazines
for scanning purpose only
Write us at optifmcybertron@gmail.com

কাগজ কেটে

পুতুল তৈরি করো

সন্ধ্যা বসু

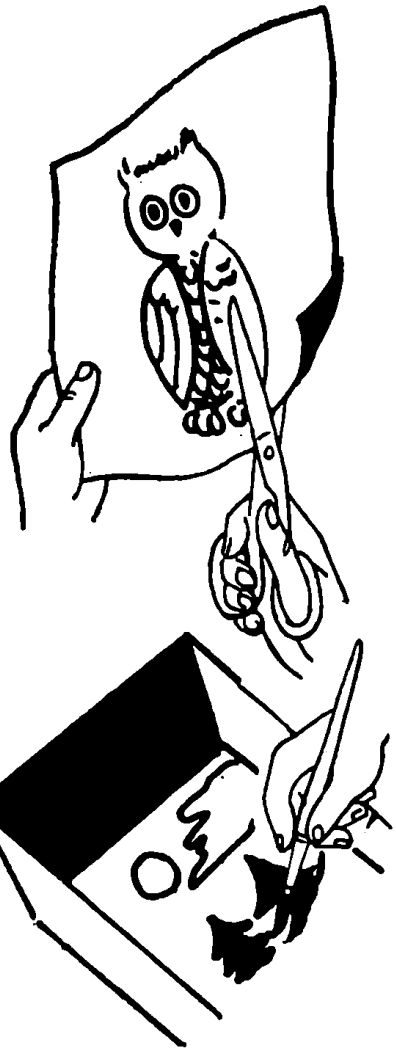

যা যা প্রয়োজন : কি ভাবে করবে ?

একটা যে-কোন সাইজের বাক্স চাই। এবার হাল্কা কার্ডবোর্ড নাও, সঙ্গে কাঁচি এবং আঠা আর যে-কোন রঙ। যে-কোন পাখী আঁক। ছবিতে বাঁপাশে যেমন দেখছো : ঠিক ১টি কার্ডবোর্ড ঐ মাপে নাও, ছবি আঁক, পিছনে তোমার পছন্দ মত ছবি এঁকে নাও। এবার কাঁচি দিয়ে কাটো। আঠা দিয়ে জোড়ো। ঠিক ঐরকম নাও, এবার আঠা দিয়ে জুড়ে নাও। পরে বাকী অংশ রঙ কর।

সবাইকে অবাক করে দাও তোমার প্রিয় পাখী দেখাও।

* পাশের ছবিটা দেখ, ঐভাবে রঙ করে নাও, তাহলে দেখবে করে ফেলেছো।

* ঠিক ঠিক করে জানিও। পরের সংখ্যায় তোমার নাম ছাপা হবে পাঠকের চিঠিপত্রে।

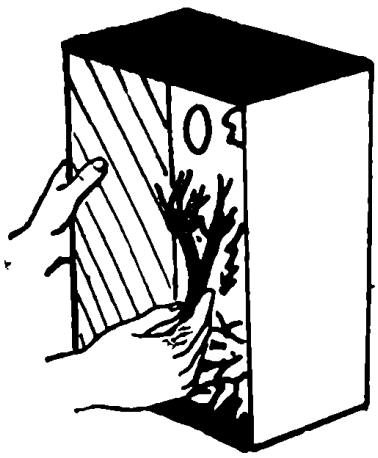

সূচীপত্র

'শুভতারা' প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা—১৩৯১

চিঠির জবাব, বিচিত্রা

প্রচ্ছদের পুরস্কার / ৩৬৩
ছবির খেলা। রূপালী সাহা / ৪২৬
চিঠির জবাব। বিষ্ণু দত্ত / ৪২১
কাগজ কেটে পুতুল। সন্ধ্যা বসু / ২য় প্রচ্ছদে

বিদেশী উপন্যাস

হিচকক এর গা-ছম-ছম করা
তিন ক্ষুদেকে নিয়ে / কঙ্কালের দ্বীপ / ৩৬৯

সম্পাদক

অমিতাভ সেন

'শুভতারা' নটরাজ প্রকাশনের পক্ষে নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী কর্তৃক ১/সি দুর্গা পিথুরী লেন, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মুদ্রণ : ইম্প্রেশন, কলিকাতা-৬
জয়শ্রী প্রেস, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউগয়া আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৯
ব্লক : রয়েল হাফটোন কলি-৭
অলংকরণ : দেবকুমার
** শুভতারা : ২৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মূল্য : ২·৫০ টাকা। Rs. 2·50

সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুরন্ত তপাই। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় / ৩৭১
ভয়ংকরের মুখোমুখি। রবীন্দ্রনাথ বসু / ৪০৩

বড় গল্প

দুঃসাহসী কিশোর। অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় / ৩৮৮
ফাঁদ পাতা ছিল। পুলক দেবনাথ / ৩৯১

হাসির গল্প

মূর্তিমান। ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৩৯৪
কবির কৌতুক। পথিক মণ্ডল / ৪১৮

বিশেষ রচনা

দ্বন্দ্ব মধুর। রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী / ৪২৩
জীবজন্তুর স্নেহ। মীরা বিশ্বাস / ৩৬৬

শব্দ সন্ধান, অনুসন্ধান, খবর

বহু বিচিত্র সংবাদ। বরুণ মজুমদার / ৪২৫
শব্দ সন্ধান। প্রদীপ কুমার দত্ত / ৪২২
ছবিতে অনুসন্ধান। মালা সেন / ৪২২

খেলা, ধাঁধা হেঁয়ালি

খেলাধূলার আসর। অজয় দাশগুপ্ত / ৩৯৮
মন ছুটে যায় খেলার মাঠে। হান্নান আহসান / ৩৯৭
হেঁয়ালি। রাজপুত্র / ৪১৭
ধাঁধা। গৌতম ঘোষ / ৪১৯
হাস্য কৌতুক। পাটুলীপুত্র / ৪১৯

কমিক্স চিত্রকথা

মহাকাশে বিপদ সংকেত। অমিতাভ সেন / ৪২৭
মটু দি গ্রেট। মৈত্রেয়ী বিশ্বাস / ৩৬৪
মরণ ফাঁদ। অমিত সেন / ৩৬৫

॥ আনন্দ সংবাদ ॥ পূজা সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিযোগিতায় টাকা পেয়ে যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন ॥

সৌমুখ চট্টোপাধ্যায় মোম বসু রঞ্জিতা দেব সুখলাল নাথানি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

** অমল কুমার ঘোষ ছবি পাঠাও নি ! পরে কোন সময় পাঠিও ছেপে দেব। যারা ছবি পাঠিয়েছো, তোমাদের সঙ্গে পাঠক পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। তোমাদের ছবিগুলি যদি ফেরৎ চাও চিঠি দিও। তোমাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ রইলো।

সম্পাদক : অমিতাভ সেন

Statements are following

This is to certify that the newspaper entitled 'Subhatara' has been Registered under the press and Registration of Book Act 1867.

Title of the newspaper		Subhatara, (Regd. W.B. CC406.)
Periodicity, Language		Monthly, Bengali.
Price of the newspaper		Rs. 2·50
Publisher's Printer's Name		Nataraj Prakashan, Nirmal Chandra Banerjee
Nationality	:	Indian
Address of the place of Publication office	:	27, Bipin Behari Ganguli Street, Cal-12
Address of the printer's	:	1/C Durga Pithuri Lane, Cal-12
Printer's Conducted	:	Impression, 33B, Madan Mitra Lane, Calcutta-6

Above Statements are true and precise account of the premises where the printing is conducted.

Editor Propritor—Amitabha Sen

Printer Publisher—Nirmal Ch. Banerjee

28. 3. 84

মরণ ফাঁদ অমিত সেন
ব্রেগুা পেরুতে বেড়াতে গিয়ে অদ্ভুত ! গ্লাইডিং বিমান চালাতে শিখছে
একটু ওপরে উঠুন মিস্ ! জায়গাটা খুব বিপজ্জনক ।
অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওরা উড়ে চলেছে……
সর্বনাশ এরা জেল ভাঙ্গা কয়েদি !
ওরা যদি ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয় ধরা পড়ে যাবো !
ব্রেণ্ডার গ্লাইডার থেকে দড়ি খুলে যায়… বাতাসে ভর করে উড়ে থাকে ! তারপর…
বিমানটা পড়ে যাচ্ছে !
ও বিমানটা পালিয়ে গেল ! দেখা যাক কতদূর—
বেশীদূর নয়, গুলি লেগেছে !

[চলবে]

মন্টু দি গ্রেট / মৈত্রেয়ী বিশ্বাস
আমার সঙ্গে থাকবে কেল্টু! কেল্টুকে বাদ দিয়ে কেউ পাহাড়ে যেতে পারবে না!...
আয় কেল্টু!
এ হতচ্ছাড়াকে আবার কোত্থেকে জোটালে!
তুমি ওকে ধরে থাকো!
ভয়ের কোন কারন নেই! কেল্টু বন্ধু হলো!
তবে চলো একসঙ্গে যাওয়া যাক!
বল্টু ও মন্টুকে চেনো না! ও..!
আরে বাবা ঠিক আছে! ওর সঙ্গী কেল্টুও সঙ্গে... থাকবে!
মন্টু বলে হ্যাঁ!
কিরে কেল্টু!
চলো ওদিকে এগোনো যাক

বাঘ ও মানুষ

মীরা বিশ্বাস

সত্যি বলতে কি জীবজন্তুরা হিংস্র হয়ে ওঠে পাক-চক্রে। যেমন এবার বাঘের কথায় আসি। বাঘ মানুষ খায় ঠিকই কিন্তু কেন? বাঘ মানুষ খেতে শুরু করে একরকম বাধ্য হয়েই। হয় কোন রকম আঘাতের জন্য কিম্বা বয়স হলে জরাগ্রস্ত তখন ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলে আর যখন বাঘের শরীরে মারাত্মক রকম আঘাত পায় তখন সে নিরুপায় হয়ে মানুষের দিকে ঝোঁকে। কিন্তু আসলে মানুষ বাঘের শিকার মোটেই নয়। বাঘ গোপনে অনুসরণ করে কিম্বা ওত পেতে থেকে আচমকা আক্রমণে শিকারকে আয়ত্ত করে। আক্রমণের সাফল্য গায়ের জোর দাঁত ও নখের ধারের ওপর। আবার যদি বাঘ কোনরকম জখমের ফলে, কিম্বা গুলি খেয়ে পঙ্গু হয়ে পড়লে পশু শিকার ছেড়ে মানুষের দিকেই এগোয়।

এমন কথাও আমরা জানি বাঘ মানুষের বন্ধুত্ব —পশুর সঙ্গে খেলাধূলাও করে থাকে। তোমরা খয়রীর কথা অনেকেই শুনেছো।

আবার যদি কোন সময় 'নন্দন কাননে' যাও দেখবে মস্ত বড় বাঘ 'রাজা' সে তার চেনা ছেলে মেয়েদের হাত চেটে দেয়, খাবারও খায়। মানুষের যেমন স্নেহ ভালবাসা আছে পশুদের মধ্যেও তাই। কোন কোন পশু প্রথম থেকেই ভয়ানক রাগী হয়। সেটা পশুদের বাবা মায়ের ওপর নির্ভর করে। মা যা

খেতে দেবে বাচ্চারা তাই খাবে; ভয়ানক মানুষ-খেকোর সম্বন্ধেও একটা কথা বলছি, বাঘ বা চিতা-বাঘ কারুরই স্বাভাবিক খাদ্য মানুষ নয়। আবার মায়ের কাছ ছাড়া হবার পর, মা যদি গোড়া থেকে কোনক্রমে বাচ্চাকে মানুষ মারতে শেখাতে সাহায্যও করে থেকে থাকে, তাহলে পরে যদি—মা না থাকে, আপনা আপনি মানুষ মারতে শুরু করেছে একথাও কিন্তু কোন সময় শোনা যায় না। জিম করবেট বলেছেন এমন একটা সত্যি ঘটনা তোমাদের বলছি; 'বাঘের মত নিষ্ঠুর' 'বাঘের মত রক্ত পিপাসু' ইত্যাদি কথা শুনলেই মনে পড়ে গাদা বন্দুক হাতে এক বালকের কথা—বন্দুকের ডানদিকের নল ছ'ইঞ্চি ফাটা, এবং নল ও কুঁদো এক সঙ্গে করে রাখার জন্য তামার তার দিয়ে বেশ আষ্টে পিষ্টে মোড়া। এখনকার তুলনায় বিশ বছর আগে দশ গুণ বেশী অনেক বাঘ ছিল জঙ্গলে। ছেলেটি তরাইয়ের এবং ভাবরের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। রাত্রি হলে সে যেখানে হোক শুয়ে পড়ত। ছোট্ট একটু আগুন জ্বালিয়ে নিত পাশে। জঙ্গলের নানা জায়গা থেকে সারা রাত্রি ধরে বাঘের ডাক ভেসে আসায় মাঝে মাঝে তার ঘুম ভেঙে যেত। তখন আগুনে আরও দুটো কাঠ গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ত। সে জানত যে বাঘকে বিরক্ত না করলে কখনো কিছুতেই ওর ক্ষতি করবে না। যদি কোন সময় দিনের বেলা বাঘ দেখতো সে এড়িয়ে যেত আর তা না হলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। একদিনের কথা বলি। খানিকটা খোলা জায়গায় কতকগুলি মুরগি চরছিল—চুপিসারে তাদের কাছে যেতে গিয়ে যেমনি কুলগাছের ঝোপের দিকে উঁকি মেরেছি, অমনি ঝোপ নড়ে উঠে ওদিক থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এলো; ঝোপটা পেরিয়ে ছেলেটার সামনা সামনি; ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—ভাবখানা যেন কী হয়েছে, এখানে কী মতলবে এসেছো কিছুক্ষণ পর উত্তর না পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্থর গতিতে ফিরে চলে গেল একটি-বারও পিছন ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। আবারও এমন হয়েছে তখন হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ ছেলে পিলে নিয়ে জঙ্গলে কাজ করতে করতে ঘাস কাটতে গিয়েও কিম্বা কাঠ কুড়োনোর সময় বাঘের চোখের সামনে নাগালের মধ্যেই চলাফেরা করেছে, এবং নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এসেছে। একটি-বারও তাদের মনে হয়নি যে কোন হিংস্র বাঘ তাদের সারাক্ষণ লক্ষ্য করছে। যদি সময়ে-সময়ে এমন সব দৃশ্য দেখতে হয়েছে, যা দেখে পাষাণ হৃদয়েরও চোখে জলও আসে, তবুও বাঘকে কোন বিনা কারণে নিষ্ঠুর হতে কিম্বা নিজের থেকে রক্তের লোভে মানুষ মারতে দেখিনি। আর সব প্রাণীর মতো বাঘও অবস্থার দাস সুতরাং যদিও বা কখনো দায়ে পড়ে সে একটা-আধটা মানুষ মারে, বা কোন কারণে খাদ্যে ঘাটতি পড়লেই গরু বাছুরের ওপর নজর দেয় তা হলে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। আর সত্যি বলতে কি যতগুলো দুষ্কৃতির জন্য বাঘকে দায়ী করি শতকরা দুই ভাগও তার প্রাপ্য নয়।

হয়ত আমার মতামতগুল এ যুগে সবাই মানবে বলে মনেও করি না।

*** আগামী সংখ্যায় জিম করবেট এর 'চৌগড়ের মানুষ শিকারের বাঘিনী'। সেই 'পাহাড়ী অঞ্চলে ছ-হাজার ফুট উঁচুতে-চল্লিশ ফুট উঁচু গাছ আর ঐ গাছে সুন্দর লাল মিষ্টি ফল মানুষ ও ভল্লুকদের বড় প্রিয় ছিল।

হিচকক-এর

রোমাঞ্চকর গা-ছম-ছম করা উপন্যাস

॥ রূপান্তর ॥ অমিতাভ ॥

কিশোরদের জন্য রহস্য-ঘন উপন্যাস লিখেছেন অ্যালফ্রেড হিচকক। তিন ক্ষুদে অনুসন্ধানী। জলদস্যুদের এককালের আস্তানা কংকাল দ্বীপের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে। ঝড়ো বাতাসে' ঢেউয়ে মাতাল অতলান্তিক—আর ভৌতিক কায়াদের আনাগোনা। তা' হোক! দুঃসাহসী তিন অনুসন্ধানী অকুতোভয়!

তিন ক্ষুদে অনুসন্ধানীকে নিয়ে দল তৈরী হল। রহস্য ভেদ করাই তাদের কাজ।

জুপিটার জোনস—পহেলা নম্বরের অনুসন্ধানী। দলের সেই মস্তিষ্ক। দোসরা নম্বরের অনুসন্ধানী পেটি ক্রেনশ,—দীর্ঘাঙ্গ এবং বলিষ্ঠ কিশোর। ব্যায়াম-কুশলী। আর শেষের জন বব অ্যানড্রুজ—খবর-বিশারদ। প্রয়োজনীয় সব খুঁটিনাটি তার মুখস্থ। তাই দলের সে রেকর্ড-কীপার।

ওয়ার্ল্ড স্টুডিওর অফিস।

মিঃ হিচকক নিজের অফিসে বসে আছেন। তাঁর সামনে ঠিক টেবিলের উলটোদিকে বসে তিন ক্ষুদে অনুসন্ধানী।

কেমন লাগলো ডুবুরির শিক্ষা নিতে? জানতে চাইলেন মিস্টার হিচকক।

ডুবুরির পরীক্ষায় ত আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি, সার। পেটি বলল।

—অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, তবে ডাইভিঙ নিয়ম কানুন, আমরা রপ্ত করেছি। আমাদের নিজেদের

মাস্ক আর পায়ের পাতা ফ্লিপার রয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রপাতি ভাড়া করে নিলেই হল। বলল জুপিটার।

মিস্টার হিচকক বললেন—ভালই হয়েছে। এবার তোমাদের একটা কাজে লাগাব।

কাজে? তবে কি উনি আবার তাদের রহস্য-ভেদের কাজে পাঠাবেন? বব জানতে চাইল কাজটা কি ধরনের।

—অভিনয় করতে হবে।

পেটি বলে উঠল—অভিনয়? কিন্তু জুপিটার ছাড়া আমরা দু'জন তো কখ্খনো অভিনয় করিনি।

—পাকা অভিনেতা চাই না। স্বাভাবিক ভাবে তোমরা সব কাজ কর্ম করবে। পেটি তুমি ত জান পরিচালক ডেনটন সাহেব একখানা রহস্যঘন ছবি তুলছেন। তোমার বাবা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। মিস্টার হিচকক বললেন।

পেটি বলল—না সার। বাবা এখন ফিলাডেল-ফিয়াতে আছেন।

—তুমি জান না, পেটি। তোমার বাবা মিস্টার ক্রেনশ এখন রয়েছেন অতলান্তিক উপসাগরের একটা দ্বীপে। আর সেই দ্বীপের নাম কঙ্কালদ্বীপ।

** "কঙ্কাল দ্বীপ" আগামী সংখ্যায় আরম্ভ হবে।

** একটুখানি পড়িয়ে রাখি:

কঙ্কাল দ্বীপ।

কঙ্কাল-দ্বীপে ছিল জলদস্যুদের আস্তানা। ওখানে অশরীরী আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। ওই দ্বীপের সাগর-জলের নীচে না-কি স্পেনের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। হয়ত এককালে ওখানে কিছু কিছু সোনা-দানা সত্যি পাওয়া যেত।

—আপনি কি ওখানে আমাদের পাঠাচ্ছেন, সার? বেশ উৎসাহের সঙ্গে জুপিটার জোন্স জানতে চাইল।

মিস্টার হিচকক বললেন—হাঁ। আমাদের যন্ত্র-বিদ্‌রা ওই দীপে যে সব যন্ত্রপাতি বসাচ্ছেন সে-সব প্রায়ই চুরি যাচ্ছে। অশরীরী আত্মাদের উৎপাৎ বেড়েছে! তাছাড়া পরিচালকের ইচ্ছে একখানা ছোট ছবি করবেন! সেই ছবিতে তিন-জন ডুবুরি জলদস্যুদের রত্ন উদ্ধারের জন্যে সাগর-জলে ডুব দিচ্ছে দেখানো হবে।

—বাঃ! সুন্দর পরিকল্পনা। ওরা বলে উঠল।

মিস্টার হিচকক ওদের উৎসাহ দিলেন।

—কোম্পানী একজন শিক্ষক ডুবুরি রেখেছে। তিনি জেফ মর্টম! ডুবুরি হওয়ার সব কায়দা তিনি শিখিয়ে দেবেন। আর তোমরা যে তিনজন রহস্যভেদী তাও গোপন রাখা হবে।

—আমরা কবে যাব, সার?

—তোমরা তৈরী থাক। আমি যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে জানাব। তোমাদের এই অভিযান নিশ্চয় মজার হবে।

তিন ক্ষুদে অনুসন্ধানী দারুণ খুশি হল।

১

একটা বিশাল সাদা-ডানা ঈগল পাখির মতন উড়ে চলেছে—সিলভার এয়ার লাইনের একখানা বিমান। পশ্চিম থেকে পুবে। সেই প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে বন জঙ্গল পাহাড়-পর্বত, শহর-গ্রাম পার হয়ে উড়ে এসেছে অতলান্তিক মহাসাগরের তীরে।

—ওই দেখ কঙ্কাল-দ্বীপ! বলে উঠল বব এ্যান্ড্রুজ।

—কই! কই···দেখি! আমাকে একটু দেখতে দাও।

জুপিটার ও পেটি ববকে সরিয়ে বিমানের জানালা দিয়ে তাকাল দেখলো কঙ্কাল-দ্বীপ।

॥ ৩ ॥

এই ঘটনার পর থেকে তপাই আর মড়া পোড়াতে যায় নি। এদিকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘদিন তপাইয়ের সঙ্গে আমারও কোন যোগাযোগ ছিল না। যে ছেলেটা হুট করতেই 'মামা' বলে এসে হাজির হোত, অনেকদিন তার সাড়া শব্দ না পেয়ে খুবই চিন্তিত হলাম।

এক রবিবার বিকেলে ওদের বাড়ির দিকে চললাম তাই।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ছোটো-খাটো একটি ভীড় আমার নজরে পড়ল। ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন লোকের মাথা ফেটেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোকটি। আর তাকে ঘিরে পাড়া-শুদ্ধ লোকের হৈ-চৈ ও ব্যস্ততা। যে লোকটির মাথা ফেটেছে তাকে আমি ভালভাবেই জানি। তপাইদের পাড়ার লোক।

নামের সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু মুখচেনা বহুদিনের। বেশ ষণ্ডামার্কা গাঁট্টাগোট্টা ভোম্বল-দাসের মতো চেহারা। সবসময় রকটি আলো করে বসে থাকে। এর মাথা ফাটাল কে! এর যা চেহারা তাতে এরই তো লোকের মাথা ফাটিয়ে বেড়াবার কথা।

যাই হোক। আমি আসা মাত্রই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল এখানে। দেখলাম সেই ভিড়-ভাট্টার মধ্যে যত লোক দাঁড়িয়েছিল সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। সকলেরই চোখ আমার দিকে। ভাবটা এই, যেন এই রক্তারক্তির আমিই নায়ক।

সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে রীতিমতো অস্বস্তি হতে লাগল আমার। কেউ সরাসরি তাকাল। কেউ আড়চোখে দেখতে লাগল। কেউবা একে অন্যের কানে ফিসফিস করে কি সব বলতে লাগল।

যে লোকটার মাথা ফেটেছে সেও দেখলাম এক হাতে মাথার একপাশ চেপে ধরে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি অবস্থা ভালো নয় বুঝে ঘাড় হেঁট করে ওদের এড়িয়ে চলে এলাম। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলাম যে এ আর কিছুই নয়, আমার ভাগ্না-ঘটিত ব্যাপার। তাই আমার গুণধর ভাগ্নার মামাকে দেখেই পাড়ার লোকেদের এই ফিসফিসিনি।

দিদির বাড়িতে যখন এসে পৌছলাম তখন দেখলাম বাড়ির পরিস্থিতিও থমথম করছে। দিদি জামাইবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। আমার বড় ভাগ্না এসেছিল দাঁইহাট থেকে। তারও ম্লান মুখে কথাটি নেই। কি ব্যাপার! ব্যাপার কি! সবাই দেখলাম ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল মারাত্মক কিছু শোনার আশায়। কেননা আমি তো বাইরে থেকে আসছি। যদি কিছু শুনে থাকি। তাই ওদের মুখাবয়ব দেখে আমিই জিজ্ঞেস করলাম—কি হ'ল? এইভাবে বসে কেন সব? পাড়াতেও খুব গণ্ডগোল দেখছি।

দিদি বললেন—আর বলিস কেন ভাই। বাইরে কিছু শুনিস নি?

—না। শুনিনি তো!

—সেকি! কিছু দেখতে পাসনি?

—একটা লোকের মাথা ফেটেছে দেখলাম। দর দর করে রক্ত ঝরছে। আর সবাই একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে দেখছে আমাকে। চারিদিকে লোকের ভীড়। জটলা। অবশ্য সে ভীড়ে তপাইকে দেখতে পেলাম না।

দিদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

বড় ভাগ্নি বলল—এইজন্যে আসি না মামা এখানে। যখনি আসি তখনই দেখি একটা না একটা ঝামেলা লেগেই রয়েছে এ বাড়িতে।

আমি বললাম—সব তো বুঝলুম। কিন্তু হয়েছেটা কি শুনি?

দিদি বললেন—কি হয়েছে জানি না ভাই। বল খেলা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে ঝগড়া। তারপর চেঁচামেচি, গালাগালি। এখন তো শুনছি কার যেন মাথা ফেটেছে।

—হ্যাঁ। মাথা তো ফেটেছে। বেশ ভালো রকমই ফেটেছে মাথা। তাতে হয়েছেটা কি?

—কি আর হবে? থানা পুলিশ হবে। সবাই তো বলছে আমাদের গুণধর ছেলেরই কাজ।

—ও বুঝেছি সেইজন্যই সব তাকাচ্ছিল আমার দিকে। তপাই কোথায়?

—কি করে জানব? সত্যি! এই ছেলেকে নিয়ে

কি যে করি। যত ঝামেলা ওকে নিয়েই। ওর জন্যে এক এক সময় আমার বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ রীতিমতো ঝামেলার ব্যাপার। এর ওপরে যদি থানা পুলিশ হয় তাহলে তো কথায় কাজ নেই। তপাই হচ্ছে ফাঁকা মাঠের বেড়াল। ওকে ধরা অত সহজ নয়। কিন্তু যদি ধরা পড়ে তখন বাড়ির লোকদের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি জামিন হওয়া অনেকদূর গড়াবে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে এলাম।

আশপাশের বাড়ির ছাদে বারান্দায় লোকজন ভর্তি। রাস্তাতেও লোকজনের ভীড়। আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সবার চোখ পড়ল আমার দিকে। আমি লক্ষ্য করলাম সকলেরই চোখের তারায় যেন এক নীরব অভিযোগ খেলা করছে।

এমন সময় হঠাৎ চারিদিকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। চোখের পলকে ভীড়ও পাতলা হয়ে গেল খানিকটা। দেখলাম কালো প্যাণ্টের পায়া মুড়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে একটা সাইকেলের চেন হাতে ছুটতে ছুটতে আসছে তপাই। ওর সর্বাঙ্গ সপ সপ করছে ঘামে। রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছে মুখ। ঠিক এই রকম মূর্তিতে এর আগে আর কখনো দেখিনি ওকে। ওর পিছু পিছু জনা দশ-বারো ছেলেও রয়েছে দেখলাম। প্রধান সাকরেদ ডিকে আর গৌতমও রয়েছে। ছিল না শুধু নসীরামের ছেলেটা।

দিদিও কখন যে এরই মধ্যে দরজার কাছে আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—ওকে ডেকে নে ভাই। আজ ও চণ্ডাল হয়েছে। না'হলে এখুনি কেন আবার খুনোখুনি করে মরবে।

আমি দরজার কাছে থেকেই হাঁক দিলাম—এই তপাই।

কিন্তু কে দেবে উত্তর?

তপাই একবার শুধু তাকিয়ে দেখল আমাকে তারপর গৌতমকে বলল—তুই একটু নজর রাখ ওদিকে। যদি দেখিস থানা পুলিশ হচ্ছে তাহলে খবর দিবি আমাকে। আমি এদিক সামলাচ্ছি।

ডিকে বলল—আরে যা! পুলিশে কি খবর দেবেরে কে! যদি ওরা সত্যিই থানায় যায়?

গৌতম বলল—আরে থাম দেখি। পুলিশে অমনি খবর দিলেই হ'ল? তুই ঘরে যা তপাই। তোর মামু এসে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক আমরা সামলাচ্ছি। আর পুলিশে যদি খবরই দেয় তো হবেটা কি? পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে মারবে এই তো!

তপাই হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে হন হন করে বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। তারপর বাড়িতে এসে কয়লা রাখার জায়গায় হাতের চেনটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল কুয়োতলায়। দড়ি বাঁধা বালতিটা ডুবিয়ে কুয়োর জল তুলে মুখ হাত পা বেশ করে ধুয়ে উঠোনের তারে ঝোলানো গামছায় জল মুছে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাবটা এমন যেন কিছুই হয়নি। হেসে বলল—তারপর মামু! কতক্ষণ?

আর মামু। বললাম—এই কিছুক্ষণ হ'ল এসেছি। তা কি ব্যাপার তোমার?

তপাই একবার ওর বাবার দিকে তাকিয়েই আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল—পরে বলব সব। আপনি যখন বাড়ি যাবেন আমিও যাবো।

সাইকেলে করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

দিদি অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তপাইয়ের দিকে।

তপাই হেসে বলল—আর তাকিয়ে কি করবে? এবার একটু চা করে দাও দেখি খাই। মামা চা খেয়েছেন?

—কখন খাবো। যা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছো বাবা।

জামাইবাবু দালানে একটা মোড়ায় বসে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এতক্ষণ তপাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন—তপাই শোন।

তপাই এগিয়ে গেল—কি।

—তুই চেন নিয়ে ঘুরছিলি কেন রাস্তায়?

—কি হয়েছে কি তাতে?

—কি হয়েছে তাতে? চেন নিয়ে কারা ঘোরে জানিস?

তপাই একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল—কি করব। যেমন জায়গা সেরকম করতে হয়।

—বুঝলুম। কিন্তু আজ যা করলি তুই এর পরে আর মুখ দেখাতে পারব পাড়ায়? সব লোক চেয়ে চেয়ে দেখছে আর হাসছে।

—যারা হাসছে তাদের হাসতে দাও।

—কি বললি?

—কেন বলব না? কে কি করবে না করবে দোষ চাপিয়ে দেবে আমাদের ঘাড়ে। আমি অমনি সেটা মুখ বুঝে মেনে নেবো? বাঃ।

জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ব্রজর মাথা কে ফাটাল? তুই না?

এতক্ষণে জানলাম লোকটির নাম ব্রজ।

তপাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তো। শুধু লোকের মাথা ফাটিয়ে বেড়াব।

—তাহলে ফাটালোটা কে!

—আমি কি করে জানব?

জামাইবাবু বললেন—কিন্তু সব্বাই তো বলছে এই বাড়ির ছেলে ফাটিয়েছে।

তপাই রেগে লাল হয়ে বলল—সেই জন্যেই তো এতক্ষণ চেন নিয়ে ঘুরছিলুম। ভিড়ের ভেতর কে কি করল না করল দোষ পড়ল আমাদের ঘাড়ে। শুধু তাই নয়, ঝগড়া হচ্ছে ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে ইট পড়বে কেন? একটুর জন্য বাচ্চা মেয়েটা রক্ষে পেয়ে গেল সেটা জানেন না বোধ হয়?

আমি বিস্মত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ইট ফেলেছে। কোথায়?

তপাইয়ের হয়ে আমার ভাগ্নিই উত্তর দিল—আর

বোলো না মামা। তোমার নাতনিকে উঠোনে কাঁথা পেতে শুইয়ে আমরা কথা বলছি এমন সময় এই এত্তো বড় একটা ইট এসে পড়ল মেয়েটার মাথার পাশে।

আমি চমকে উঠলাম—সেকি!

—দেখবে ইটটা? বলেই ভাগ্নি অদূরে পড়ে থাকা ইটটাকে কুড়িয়ে এনে আমাকে দেখাল।

ইটটা হাতে নিয়েই শিউরে উঠলাম আমি। এই ইট সত্যিই যদি এসে পড়ত মেয়েটার গায়ে তাহলে কি অবস্থা হোত?

তপাই বলল—এর পর আর মাথার ঠিক থাকে?

বললাম—না। এই জন্যেই কি ওর মাথা ফাটিয়েছিস?

তপাই বলল—মামা, অমন কাঁচা কাজ আমি করি না। আছি ভালো। কিন্তু রাগলে আমি বিষখোবড়া ছেলে। আমি তখন এখানে থাকলে ওর মা'থা ফাটাতাম না। হাত দুটোকেই ছিঁড়ে আনতাম। আমার নাম তপাই।

—তাহলে ফাটালো কে?

—কে জানে। ওরা স্বপনের নাম বলছে বলে অত রেগে গিয়েছিলুম।

—স্বপন!

—হ্যাঁ। ওরা বলছে স্বপন ওর মাথা ফাটিয়েছে। স্বপন আমার ছোট ভাগ্না বারো তেরো বছরের ছেলে। সে কি করে মাথা ফাটাবে ঐ ষণ্ডা গুণ্ডাটার? এও কি সম্ভব! তাছাড়া স্বপন অতি শান্ত মেধাবী ছেলে।

দিদি বললেন—স্বপন কোথায়?

—জানি না। বোধ হয় ক্লাবে গিয়ে জটলা করছে।

জামাইবাবু বললেন—কিন্তু এত লোক থাকতে স্বপনের নামই বা করছে কেন ওরা?

—তাহলেই বুঝে দেখুন। ভিড়ের ভেতর কে গিয়ে মাথা ফাটাল আর দোষ চাপলএকটা বাচ্চা ছেলের ঘাড়ে। এর পরেও মাথা গরম না হয়ে যায়?

দিদি নিজের মনেই বলতে লাগলেন—জানি না বাবা, কি যে আছে কপালে। কপালগুণে জুটেওছে সব এসে আমার কাছে।

আমার ভাগ্নি কথাবার্তার ফাঁকেই চায়ের জল বসিয়েছিল। এবার তৈরী চা নিয়ে এসে কাপে কাপে ঢেলে দিল সবার হাতে।

সবে এক চুমুক দিয়েছি চায়ে এমন সময় এক মধ্য বয়সী মহিলা এসে হাজির হলেন সেখানে। কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন—তপাই কোথায় গো, তপাই?

জামাইবাবু মোড়ায় বসেছিলেন। উঠে এসে বললেন আসুন আসুন কাকিমা। তপাই এই তো ঘরে।

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তোমরা কেন মিছি মিছি মাথা গরম করছ বাবা? আমরা তো কিছু বলিনি তোমাদের। শুধু শুধু মারামারি করবো, এসব কি কথা? তা থাকগে। আমার ছেলের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। আর কিছু কোর না তোমরা। আমার ছেলের দোষ আছে জানি। তোমরাও তো মাথা ফাটিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছ। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। না কি গো মামা?

আমি আর কি করি। বললাম—সে তো বটেই। রাগারাগির মাথায় যা হবার তা হয়ে গেছে। আর একে বাড়তে দেওয়া উচিৎ নয়!

তপাই রেগে বলল—আবার আপনি ঐ একই কথা বলছেন, আমরা মাথা ফাটিয়েছি?

মহিলা বললেন—আমি তো চোখে দেখিনি বাবা। আমার ছেলে বলল তোমার ছোট ভাই মাথা

ফাটিয়েছে। তাই বলছি।

তপাই বলল—আপনি আর একবার ভালো করে জিজ্ঞেস করে আসুন, আমার ছোট ভাই ফাটিয়েছে না আমার মামা ফাটিয়েছে।

মহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা! সেকি কথা! তোমার মামা এই তো এলো। সে ভদ্রলোকের ছেলের নামে দোষ দেবো কেন? এভাবে গায়ে পড়ে দোষ নিও না। যা সত্যি তাই বললুম।

—ঐ জন্যেই তো চেন নিয়ে ছুটেছিলুম। আমার ভাই একটা বাচ্চা ছেলে, সে গিয়ে তোমার ঐ চল্লিশ বছরের ধেড়ে ইঁদুরের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এলো এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?

দেখলাম কথা কাটাকাটি উত্তরোত্তর চরমে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তাই মধ্যস্থ হয়ে বললাম—আচ্ছা ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে। এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে দেখছি। বলে তপাইকে জিজ্ঞেস করলাম—স্বপন কোথায়?

জামাইবাবু বললেন—যেখানেই থাকুক। ওর কানটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসো দেখি?

এমন সময় দেখা গেল আমার বড় ভাগ্না শঙ্করই ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

জামাইবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওর কাছে গিয়ে ঠাস করে মারলেন এক চড়। তারপর এক হাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—বল কেন এইসব গুণ্ডামি করেছিস? বল শিগ্‌গির। খুনে হবি? ডাকাত হবি? বল কেন মাথা ফাটিয়েছিস ব্রজর?

স্বপন রেগে ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল—আমি ফাটিয়েছি। আপনি দেখেছেন?

—আমি দেখব কেন? সবাই তো বলছে।

স্বপন বলল—এ পাড়ায় মানুষ আছে নাকি? যত সব মিথ্যেবাদীর দল। যে বাপের ব্যাটা হবে সে আমার সামনে এসে বলবে।

এর ওপর দিদি এসে এক ঘা বসিয়ে দিলেন—এ পাড়ায় সব মিথ্যেবাদীর দল। আর একা তুমি যুধিষ্ঠির না? পাড়াশুদ্ধ লোক সবাই মিথ্যে বলছে?

স্বপন রেগেমেগে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গর গর করতে করতে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে কোচিং-এ পড়তে চলে গেল।

স্বপন চলে যাবার পর মহিলাও চলে গেলেন।

জামাইবাবু বললেন—আপনি যান কাকিমা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, বলে জামা-কাপড় পাল্টে জামাইবাবুও চলে গেলেন।

জামাইবাবু চলে যাবার পর দিদি বললেন—সত্যি করে বল তো তপাই ব্রজর মাথা কে ফাটিয়েছে?

তপাই ফিক করে একটু হাসল। সে হাসির অর্থ সবাই বোঝে।

আমার তো চোখ কপালে উঠে গেল।

তপাই বলল—স্বপনই ফাটিয়েছে।

—বলিস কিরে!

তপাই বলল—মামা, আমি একটা দাগী ছেলে। আমার কথা ছেড়ে দিন। তবে আপনার ঐ ছোট ভাগ্নাটিকেও কিছু কম বলে মনে করবেন না।

—কিন্তু স্বপন ঐটুকু ছেলে···।

—ও একটা মিচকে শয়তান। থাকে নিরীহ প্রাণীটির মতো। কিন্তু রাগলে কারো নয়। তবে আজকে ও যা করেছে তা ঠিক করেছে। আপনি একবার ভেবে দেখুন তো, ঐ অতবড় ইঁটটা যে বাড়ির ভেতর পড়ল যদি কারো মাথায় লাগত?

—সে তো বটেই। তবে ব্যাপার কি জানিস, হুট করে রাগের মাথায় সহসা কোন কাজ করতে নেই। ধর স্বপনের ইটের ঘায়ে লোকটা যদি মরে যেত? যদি ওরা এই ব্যাপার নিয়ে থানা পুলিশ করত?

তপাই বলল—যদি হিম্মৎ থাকে তো এখনো করুক না। ইট তো তোলাই আছে। পুলিশ এলে দেখাব।

—কিন্তু স্বপন ওর মাথাটা ফাটাল কি করে?

তপাই বলল—তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই শুনুন। এই মাঠে আমাদের দুটো গ্রুপ আছে। একটা ছোটদের, একটা বড়দের। ছোটরা যখনই মাঠে খেলে বড়দের তখনই চোখ টাটায়। আজ বিকেলে ছোটরা যখন খেলছিল, বড়রা তখন মাঝে মাঝে এসে নানারকম মন্তব্য করছিল। তবে খারাপ কেউ কিছু বলেনি। এমন সময় ব্রজদা হঠাৎ কোথা থেকে এসে গালাগালি শুরু করে দিল। তারপর কোথাও কিছু নেই গা-জোয়ারি করে গোল-পোস্টটাকেই উবড়ে ফেলে দিল। তাইতেই কে যেন একজন মুখ খারাপ করে কি বলেছে। সেই রাগে কোথাও কিছু নেই দুম-দাম ইট ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিল ব্রজদা। স্বপন তখনও কিছু বলেনি। কিন্তু যেই একটা ইট এসে আমাদের বাড়িতে পড়েছে অমনি ওর মাথা গেছে গরম হয়ে। তার ওপর বাড়ি এসে যখন দেখল আর একটু হলেই দিদির মেয়েটা শেষ হয়ে যেত তখন আর থাকতে পারল না। ঐ ইটটা ও নিয়ে গিয়ে মাথার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। একেবারে মোক্ষম ঘা যাকে বলে।

দিদি বললেন—অথচ স্বপন আমাকে বলল ইটটা আমি পাড়ায় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। কি শয়তান ছেলে বল দেখি?

আমি বললাম—ও কিছু না। ছোটবেলায় একটু আধটু ডানপিটে অনেকেই থাকে। বড় হলে বুঝতে শিখলে ঠিক হয়ে যাবে। ওর জন্যে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।

আলোচনা শেষে চুপ-চাপ বসে রইলাম আমরা। মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার বেরিয়ে গেলে আর তো তাকে ফেরানো যাবে না। অগত্যা চুপ চাপ বসে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি?

তপাই এবার ঘরে ঢুকে জামা-প্যান্ট ছেড়ে আমাকে ইসারা করল। অর্থাৎ কিনা চলুন এবার।

আমিও আসি বলে উঠে দাঁড়ালাম।

ছোট ঘর থেকে সাইকেলটা বার করল তপাই।

আমি ওকে চুপি চুপি বললাম—চল। তবে সামনে দিয়ে নয়। নতুন রাস্তা দিয়ে ঘুরে। নাহলে আবার যদি সবাই দেখতে আরম্ভ করে তো ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।

তপাই বলল—সে কথা আবার বলতে? এই আমিও যে যাচ্ছি রাত এগারোটার আগে কি আমি ঘরে ঢুকব?

আমি তপাইয়ের সাইকেলে সামনের দিকে বসলাম। ও ডবলক্যারি করে আমাকে মধ্য হাওড়ায় আমাদের বাসস্থানের দিকে নিয়ে চলল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসেই দেখি শঙ্কর এসে বসে আছে। শঙ্কর আমার বড় ভাগ্না। এদের দু'ভাইয়ের থেকে একেবারেই অন্যরকম। লেখাপড়া মন দিয়ে করে না। তবে কোন ঝামেলাতেও বড় একটা থাকে না।

শঙ্করকে দেখে বললাম—কি ব্যাপার রে?

—মা একবার দেখা করতে বলেছে আপনাকে। খুব দরকার। সাইকেল এনেছি। রাত্রিবেলা পৌঁছে যাবো।

—বেশ খাবো। এই তো এলাম। আগে একটু চা-টা খাই।

—সে খান না। আমিও তো খাবো।

আমি অফিসের পোশাক ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে এলে মামা-ভাগ্না দুজনেই এক সঙ্গে চা-রুটি খেলাম। তারপর ওর সাইকেলে চেপেই চললাম ওদের বাড়ি।

দিদি জামাইবাবু আমার বড় ভাগ্নি সবাই ছিল। আমি ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন দিদি?

দিদি বললেন—তোর কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেবো বলে ডেকেছি তোকে।

—কি রকম!

—ভাবছি তপাইটাকে এখান থেকে কোথাও সরানোর ব্যবস্থা করি। নাহলে ঐ বিষবৃক্ষ আমার সব ছেলেকটাকে নষ্ট করে দেবে।

আমার দিদির ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মেয়ে। তারপর ছেলে অর্থাৎ শঙ্কর। শঙ্করের পর তপাই। তারপর স্বপন। দিদির কথা শুনে হেসে বললাম—হঠাৎ আবার কি ভূত মাথায় চাপল তোমাদের? কালকের ঐ ব্যাপারটা নিয়ে? তাই যদি হয় তাহলে তপাইয়ের এখানে দোষ কোথায়?

জামাইবাবু বললেন—আছে দোষ আছে। কাল কি ভাবে লোকটার মাথা ফাটিয়েছে তা তুমি ভাবতে পারবে। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে লোকটাকে।

—কিন্তু ওর মাথা তো আপনার ছোটছেলে ফাটিয়েছে।

—মূলে তো তপাই। নাহলে এত সাহস পায় কোত্থেকে? তপাইয়ের মূর্তি দেখলে না কাল?

—দেখলাম তো।

—তবে।

—ওর পাল্লায় পড়েই স্বপনটা ঐরকম হয়েছে। নাহলে ঐটুকু ছেলের কি দুঃসাহস। এখনই যদি এই রকম নিষ্ঠুর হয় তো পরে কি হবে?

আমি হেসে বললাম—দেখুন ছেলে আপনাদের। তাকে ভালো করবার জন্য যত রকম চেষ্টা করা যায় করুন আপনারা। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে, দুদিন বাদে আপনাকেও হয়তো···?

জামাইবাবু রেগে বললেন—এই জন্যেই আমি ডাকতে চাই না তোমাকে। তুমি সবসময় হেঁয়ালি করে কথা বলো। আমার ছেলেদের তুমিও যথেষ্ট আস্কারা দাও।

দিদি বললেন—তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। স্বপনের এখন ধারণা হয়েছে কি জানিস, যা কিছুই করুক না কেন সে, তার মস্তান দাদা তপাই তো আছে। তপাইয়ের ভয়ে কেউ কিছুই বলবে না। সেইজন্যেই অত সাহস। তার চেয়ে যদি এখান থেকে বিদেয় করতে পারি তো সবকিছুর শান্তি।

আমি কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না। বাবা মা কতখানি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে তবে ছেলেদের ওপর এতখানি রেগে যান তা বুঝলাম।

দিদি আবার বললেন—ও ঘরে থাকলে আমার আর দুটো ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে। দিন রাত শুধু মড়া পোড়ানো আর ঝুটঝামেলা করা। ওর জন্যে পাড়ায় আমরা মান-ইজ্জত সব খুইয়েছি। তাই ভাবছি আমাদের আর দুটো ছেলের মুখ চেয়ে ওকেই সরাই।

কথাটা বড়ই মর্মান্তিক। শুনে বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠল।

ভাগ্নি বলল—আমি বলছিলুম কি মামা ও আমার সঙ্গে বরং দাঁইহাটেই চলে যাক।

—বেশ তো। এ তো খুবই ভালো কথা। সঙ্গগুলো একটু ত্যাগ করিয়েই দেখ না যদি কিছু হয়।

দিদি বললেন—কিন্তু ও তো যেতে চাইছে না।

—কেন? কি বলছে ও?

—ও বলছে কুটুমবাড়িতে ও থাকবে না।

—তাহলে তোমাদের দেশে পাঠাও।

—সে তো আর এক জায়গা। সেখানেও যা সব আছে গোটাকতক তার ওপর উনি ভিড়লে তো একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়ে যাবে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম—ওর ছোট পিসিতো তারকেশ্বরে থাকে। ওখানে রেখে এলে হয় না?

—হয়। তবে ওদেরও অভাবের সংসার। তপাই কিন্তু ওখানেই যেতে চাইছে। তোর জামাইবাবু রাজি হচ্ছে না।

—ওরা কিন্তু খুব ভালো লোক। আমার কথা যদি শোনোতো ওকে ওখানেই পাঠাও। মাঝে মধ্যে কিছু খরচ খরচা নাহয় পাঠিয়ে দিও।

জামাইবাবু বললেন—অসুবিধেটাতো সেইখানেই। ওরা কি খরচ খরচা নেবে?

এমন সময় তপাই এলো। কোথায় আড্ডা মারছিল কে জানে। উঠোনের জবা গাছের কাছে সাইকেলটা রেখে দালানের সিঁড়িতে হাত পা ছড়িয়ে বসে বলল—আমার বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। শুনেছেন তো মামা। আমি এখন এ বাড়ির আপদ বালাই। মাছের কাঁটার মতো আমি আটকে আছি প্রত্যেকের গলায়। তবে মামা আমিও বলে রাখছি, এই পাড়া থেকে আমি চলে গেলে এদের অবস্থাটা একবার কি হয় দেখে রাখবেন। এদের যদি ছাগলে মুড়িয়ে না খায় তো আমার নাম তপাই নয়। আমার ভয়ে এখানে কেউ ট্যাঁ ফোঁ করে না। এইবার দেখবেন কথায় কথায় সব বুঝবে কিরকম। যাক। ভালোই হ'ল। এদের উঁচু মাথা আরো উঁচু হোক। এ সব পাড়াকে তো এরা চেনে না। পায়ে পা তুলে যখন সব উল্‌খাট ঝামেলা লাগাবে আমি তখন 'ভোলে বাবার' ডেরায় বসে মজা দেখব। তাছাড়া সত্যি বলতে কি আমারও খুব একঘেয়ে লাগছিল এখানে। এবার আমিও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। তবে এই যে আমি বাড়ি ছাড়ছি, আর আমি এ মুখো হবো না কোনদিন।

দিদি রেগে বললেন—দরকার নেই তোর এ মুখো হবার। তোর মুখ দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

তপাই হেসে বলল—বেশ তো। আমি বিদেয় হই, তারপর রোজ দুবেলা তোমার অন্য ছেলেদের মুখ ধুয়ে তুমি জল খেয়ো। কেমন?

আমি দুপক্ষকেই সামলালাম। দিদিকে বললাম—দেখ, যতই দুরন্ত হোক, তবু তোমার ছেলে। ও কথা বলতে নেই।

দিদি মুখের ওপরই বললেন—তুই বিশ্বাস কর, ও মরে গেলেও আমার চোখ দিয়ে এতটুকু জল পড়বে না।

এর ওপরে আর কথা নেই। তপাইকে বললাম—অভিমান করিস না তপাই। তোর ভালোর জন্যেই তোকে এখান থেকে সরানো হচ্ছে।

তপাই হোঃ হোঃ করে হেসে বলল—অভিমান! কার ওপর? মা বাবার ওপর? মামা, মড়া মানুষকে চিতায় তোলা আমার নেশা। মানুষ-গুলো যখন আগুনের আঁচে ফুট ফাট করে পোড়ে আমি তখন হাসি। মনে মনে বলি, এই তো

তোমাদের অন্তিম পরিণতি। এর জন্যে এত কিছু?

আমি বললাম—ও সব কথা রাখ। জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার হওয়া খুব ভালো। তবে এখনো বলছি তোর পরিবেশ পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। তাছাড়া দিনকাল একে খারাপ। এর ওপর দুদিন ছাড়াই এই সব ঝামেলা হতে থাকলে মানসিক অবস্থারও অবনতি হবে। আসলে তুইও ভালো ছেলে। কিন্তু এই নোংরা পরিবেশের জন্যে আজ তুই এইরকম হয়ে গেছিস। ভালো জায়গায় যা, ভালো পরিবেশে থাক, দেখবি কত পরিবর্তন হয়েছে তোর। তাছাড়া অন্য পরিবেশে গেলে নিজেও একটু শান্তি পাবি। ভালো না লাগে ফিরে আসতে কতক্ষণ? এই বলে আমি চলে এলাম।

তপাই গুম হয়ে বসে রইল।

পরদিন সকালে দিদি নিজে গিয়ে তপাইকে তারকেশ্বরের কাছে একটি গ্রামে ওর পিসির বাড়িতে রেখে এলেন।

হাওড়ার এই ঘিঞ্জি সহরের বাইরে হুগলি জেলার ছায়া সুনীবিড় ঐ গ্রামখানি তপাইয়ের মন্দ লাগল না। পুকুর বাগান ধানক্ষেত ফাঁকা মাঠ - মাঠের মেঠো গন্ধ তপাইয়ের মন প্রাণ ভরিয়ে দিল।

আমরা ভেবেছিলাম সহরের এই পরিবেশ ছেড়ে তপাই কিছুতেই গ্রামে থাকতে পারবে না। দুদিন কি চারদিন থাকার পর একদিন হয়তো ঠিকই পালিয়ে আসবে। কিন্তু না। তপাই আমাদের সকলের ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিল।

মা বাবা যতই বকা ঝকা করুন না কেন, হাজার হলেও ছেলে তো। প্রতিদিন খাওয়া দাওয়ার পর ওর জন্য দুটো ভাত তরকারি আলাদা রাখা থাকত। কি জানি কোনদিন হঠাৎ যদি দিন দুপুরে ছেলেটা এসে হাজির হয়।

কিন্তু না। ওর আশা করাই বৃথা হ'ল সকলের। গ্রামের পরিবেশে গিয়ে তপাই এমন ভাবে গ্রামকে ভালবেসে ফেলল যে সহরকেই ভুলে গেল এক সময়। কোথায় গেল ডিকে, কোথায় গৌতম, কোথায় নসীরামের ছেলে। সেখানে গিয়ে দু' চারদিন ভিজে বেড়ালের মতো থাকার পর আবার নতুন সঙ্গী পেয়ে মেতে গেল।

এখনকার গ্রাম ও তো আর আগেকার সেই গ্রাম নেই। প্রতিটি গ্রামেই এখন ডজন ডজন তপাই জন্মায়। কাজেই লাইনের ছেলে বেশ কয়েকটা জুটে যেতে খুব একটা দেরি হ'ল না তপাইয়ের।

দু'চারদিন মাঠে ঘাটে একা একা ঘোরা ফেরা করতেই নজরে পড়ে গেল সকলের।

একদিন কয়েকজন ছেলে এসে ধরল ওকে—কি ভায়া। কোত্থেকে আমদানি হ'লে?

তপাইয়ের ও নিজস্ব কিছু ভাষা আছে। সেই ভাষাতেই সেও জবাব দিল—আমি হাওড়ার মালরে বে। দেখে বুঝতে পারছিস না?

ওরা বলল—গুরু গুরু। তা এখানে কি ব্যাপারে?

—নির্বাসন।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। যেখানে থাকতুম সেখানে, মানে আমার বাড়িতে পাড়ায়, নিজের গুণের জন্যে সকলের এতটু অসহ্য হয়ে উঠেছিলুম। তাই আমার বাড়ির লোকেরা এখানে আমাকে আমার পিসির বাড়িতে নির্বাসন দিয়ে গেছে।

—বলো কি! তবে তো তোমার সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে হচ্ছে ভাই।

তপাই হাত মেলাবার জন্য হাত এগিয়ে দিল।

ওরা হাতে হাত মিলিয়ে বলল—তোমার নামটি কি

ভাই ?

তপাই বলল—আমার ভালো নাম তপন। তোমরা আমাকে তপাই বলেই ডেকো। কেননা ঘরে বাইরে পুলিশের খাতায় ঐ নামেই আমি বিখ্যাত।

—গুরু গুরু। তা গুরু, একটা কথা আগেই বলে রাখি। তোমার বাড়ির লোক তোমাকে তাড়াতে পারে, পাড়ার লোক দূর দূর করতে পারে, বন্ধুরা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আমরা কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না। এই যে আমাদের কটি মাল দেখছ, সবাই আমরা একই সুতোয় গাঁথা মালা।

—বাঃ শুনে খুসি হলাম।

—খুসির এখন হয়েছে কি। আরো খুসি হবে শুনে, আমরাও তোমারই মতন বাপে মায়ের তাড়ানো ছেলে। আমরা তোমাকে বুকে করে রাখব। আমরা শুধু খাবার সময় ঘরে যাই আর বাকি সময় হৈ হৈ করে বেড়াই।

তপাই খুসি হয়ে বলল—বেড়ে মজা তো!

—মজা হবে না কেন ? আমাদের তো তোমাদের মতন রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিনে খেতে না। জমি জমা যা আছে তাতে সকলের দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে হয়ে যায়। আর তুমি যদি বরাবরের জন্যে থেকে যাও গুরু, তাহলে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি করে পেটটা ঠিক চলে যাবে তোমার।

—ঠিক বলছ ?

—বাবা তারকনাথের দিব্যি।

তপাই বলল—তবে ভাই একটা কথা। এই হৈ-হল্লার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমি আরো একটা কাজ ওখানে করতাম। তোমাদেরও কিন্তু আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সেই কাজটা এখানেও করতে হবে।

—কি রকম।

—এই ধরো চাঁদা তুলে কোন গরীবের মেয়ের বিয়ে দেওয়া। কোন দুঃস্থ মানুষের মৃতদেহ দাহ করা। এইসব কাজ আর কি।

—আরেব্বাস! তুমি যে দেখছি হিন্দী ফিল্মের হিরো। ঠিক আছে। রাজি আছি।

—সেইসঙ্গে আরো একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ বলো ?

—এই গ্রামে আমরা কজন এমন একটা দল গড়ে তুলব যে আশপাশের লোকেরা যেন আমাদের রীতিমতো ভয় করে। আমাদের ভয়ে রাত ভিতে এই গ্রামে চোর-ডাকাত ঢুকতেও ভয় পায় যেন।

—গুরু গুরু। আবার হাতে হাত মেলাও। সবাই রাজি আমরা। তুমি গুরু একেবারে হিরোর মতো এসে হাজির হয়েছ। জয় বাবা তারকনাথ। সবাই তখন তপাইকে পেয়ে এমনভাবে মেতে উঠল যে ওকেই ওদের লিডার করে ফেলল। আসলে তপাইয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে খুব সহজেই ও অন্যকে বশ করে ফেলতে পারে।

আলাপের প্রথম দিনই তারকেশ্বরে গিয়ে একটা হিন্দী ছবি দেখে এলো ওরা।

তারপর একদিন গেল চাঁপাডাঙায় দামোদর নদ দেখতে। দামোদরের বাঁধ কি চমৎকার।

সবচেয়ে চমৎকার এখানকার পরিবেশ। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মাঠে মাঠে ঘোরা আর পাখির ডাক শোনা। তারপর চা-মুড়ি খেয়ে বন্ধুদের আড্ডায়। বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে বাড়ি। এরপর পুকুরে টুপ টুপ করে ডুব দিয়ে মাটির দাওয়ায় বসে পেট পুরে খাওয়া শুধু ডাল-ভাত তরকারি। বরাৎ যেদিন ভালো থাকে সেদিন চুনো-পুঁটি ল্যাটা পোনাও জোটে। খাওয়া শেষে পান মুখে আবার

বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হওয়া। তারপর কখনো খড়ের গাদায় কখনো গাছতলায় কখনো বা ক্লাবঘরে শুয়ে তেড়ে ঘুম। বিকেলবেলা ইউরিনের মতো এক কাপ চা। তারপর আবার সেই বিশ্ব-বখাটেদের দলে ভেড়া। মাঠে মাঠে ঘুরে, আশপাশের গ্রামগুলোকে চষে, কখনো বা নাইট শো'তে তারকেশ্বর অথবা চাঁপাডাঙায় সিনেমা দেখে, কোন পুকুরপাড়ে অথবা বাঁধের ধারে নেশা করে পড়ে থাকা। যেদিন ঐসব করা সেদিন আর ঘরে ফেরা নয়। কি চমৎকার জীবন। কাজ করতে হয় না। কিছু করতে হয় না। শুধু খাও-দাও আড্ডা দাও টোটো করে ঘোরো আর স্ফূর্তি করো। কি মজা। এমন জীবন কে না চায়? এত সুখ যে স্বর্গেও নেই।

একদিন ওরা রাত্রিবেলা চাঁপাডাঙা থেকে সিনেমা দেখে ফিরছিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ উঠল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। ওরা ছুটতে ছুটতে বাঁধ থেকে কাছেই শ্মশান যাত্রীদের জন্য একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

বেশ বড়সড়ো কোঠা ঘর। জানলা দরজা সবই আছে। শুধু আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। শ্মশান যাত্রীরাই যে যার লণ্ঠন বাতি সঙ্গে নিয়ে আসে। যাই হোক। ওরা ঝড় জলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই শ্মশান ঘরেই গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি তো নয়। প্রবল বর্ষণ। যেমনি ঝড় তেমনি জল। সে কি প্রচণ্ড বেগ। ওরা ঝড় জলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য!

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ছট হাট করে খুলে গেল জানলা দরজাটা।

ভারি মজার ব্যাপার তো।

দরজায় খিল আছে। জানলায় ছিটকিনি আছে। তবু খোলে কি করে?

তপাই বলল—নিশ্চয়ই আমাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে বদমায়েসী করে খুলে দিয়েছিস?

বন্ধুরা বলল—না। কে খুলবে আমাদের ভেতর থেকে? আমরা তো সবাই পাশাপাশি বসে আছি। ঝড়ের দাপটেই খুলে গেছে নিশ্চয়ই।

একজন বলল—ঝড়ের দাপটে জানালা খুলে গেলেও দরজা খোলে কি করে? দরজায় তো খিল দেওয়া ছিল।

আর একজন বলল—আমি কিন্তু ভালো বুঝছি না। এই জায়গাটার খুব বদনাম আছি। অনেকদিন আগে একটা লোক এই ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর থেকে এই জায়গা সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথাই শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে ঐ রকমই কিছু।

বন্ধুরা বলল—তা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মুসকিল হ'ল এই ঝড় জলে এখানকার এই আশ্রয় ছেড়ে যাই-ই বা কি করে?

তপাই বলল—দেখ ভাই, পোড়ো বাড়িতে রাত কাটানো বা শ্মশানের বিভীষিকার সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয়। আমার মনে হয় তাড়াতাড়িতে আমরা দরজায় খিল দিতে বা জানলায় ছিটকিনি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে সশব্দে জানলা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তপাই বলল—ভালোই হল। বলে নিজেই উঠে গিয়ে অন্ধকার হাৎড়ে দরজায় খিল দিল, জানলায় ছিটকিনি আঁটল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এসে বসল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। বলল আজ যা অবস্থা দেখছি তাতে আর বাড়ি ফিরতে হচ্ছে না। আজ সারারাত এখানেই পেট কোলে করে বসে

থেকে কাল সকালে ঘর মুখো হওয়া যাবে।
বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপট। থেকে থেকে গোঁ গোঁ করে শব্দ হচ্ছে। এই রকম হতে হতে হঠাৎ এক সময় ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁচ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই খিলটা আপনা থেকে খুলে গিয়ে সশব্দে দুহাট হয়ে গেল দরজাটা।
যেই না যাওয়া সকলেরই তখন চক্ষুস্থির। বসেছিল সবাই। মারল টেনে এক লাফ। তারপর কেউ আর কোনদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই দৌড়—দৌড়—দৌড়।
বড় বড় গাছপালার ফাঁক দিয়ে কর্দমাক্ত পথ ধরে ছুটে গিয়ে বাঁধে উঠল সবাই। ভিজে সপ সপ করছে সর্বাঙ্গ। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল সব। সবাই সবাইয়ের মুখের দিকে তাকায় আর ঠক ঠক করে কাঁপে। না কাঁপবেই বা কেন? যা দেখল তার পরে ভয় না পাওয়াটা কি অস্বাভাবিক?
তপাই বলল—দেখ ভাই, আমি এখনো বলছি ঐসব আমি বিশ্বাস করি না। তবুও যা দেখলাম তাকেও অবিশ্বাস করতে পারি না। আমি নিজে হাতে যে খিল লাগিয়ে দিয়ে এলাম সে খিল খুলল কি করে? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।
বন্ধুরা বলল—ওকেই আমরা ভূতুড়ে ব্যাপার বলি। তোরা সহরের ছেলেরা তো বিশ্বাস করিস না এসব। গ্রামে ঘরে এই রকম কিন্তু প্রায়ই হয়।
তপাই বলল—আমার জীবনে এ রকম ঘটনা এই প্রথম।
বন্ধুরা বলল—আসলে অপদেবতারা যে সব সময় দেখা দেয় তা নয়। এই রকম অদ্ভুত কিছু দেখিয়ে প্রথমেই মানুষকে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। এসব দেখেও যদি কেউ কোন গোঁয়ার্তুমি করবার চেষ্টা করে তখন তারা নানাভাবে ভয় দেখায় বা ক্ষতি করে।
তপাই সব শুনল। কিন্তু কিছু বলল না। কিই বা বলবে? এরকম অভিজ্ঞতা তো এই প্রথম। যাই হোক। ওরা অনেক রাতে ঝড় জল মাথায় করে ঘরে ফিরল।

পরদিন সকালে এই নিয়ে তপাইয়া একটা জোর আলোচনায় বসল। শ্মশানঘরের ঐ ক্ষণিকের বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা সকলেই জেনে গেল প্রায়। সবাই বলল—ঐ ঘরটার এই সব ব্যাপারে একটু বদনাম আছে। এ অবশ্য লোকের মুখে শোনা। ঐ জন্যে সচরাচর রাত্রি-বেলা দলে ভারি না হয়ে কেউ মড়া পোড়াতে গিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে না। তবে যা হয়েছে হয়েছে। আর যেন কেউ ভুলেও ও ঘরে যেও না। খুব ভাগ্য ভালো যে বেঁচে ফিরে এসেছ সব।
কথাটা তপাইয়ের পিসিমা পিসেমশাইয়ের কানেও উঠল। পিসেমশাই তো খুব বকাবকি করলেন তপাইকে। বললেন—দেখো বাবা, তুমি যাতে ভালো হও, বদ সঙ্গে না মেশো সেইজন্যেই তোমার মা বাবা তোমাকে আমার এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখানে এসেও তুমি যা আরম্ভ করেছ তাতে তো আমি রীতি মতো ভয় পাচ্ছি। কাজ কর্ম না করো দুঃখ নেই। খাও দাও টো টো করে ঘোরো। শুধু দয়া করে নেশাটি কোর না। আর ঐ বদ ছেলেগুলোর পাল্লায় পড়ে যেখানে সেখানে যেও না। ধরো দৈবাৎ যদি কোন অঘটন ঘটে যেত কাল তাহলে তোমার মা বাবার কাছে কি কৈফিয়ত দিতাম আমি? রাত ভিত যে এইভাবে যেখানে সেখানে ঘোরো যদি সাপেই কামড়ায়?
পিসিমা বললেন—সত্যি বলছি, তুই যদি ভালো-ভাবে না থাকিস তাহলে কালই আমি চিঠি লিখব

তোর বাবাকে।

তপাই বলল—রাগ করছ কেন পিসি? কি থেকে কি হয়ে গেল কাল। ভূত প্রেত ওসব কিছুই নয়। আসলে দমকা হাওয়ার ধাক্কাতেই হয়তো খিলটা খুলে যাচ্ছিল।

—তা সে যাই হোক বাবা। আর কখনো যাস না সেখানে। আর একটা কথা, আজ থেকে সন্ধ্যে হলেই ঘরে ঢুকবি। প্রত্যেকে নিন্দে করছে তোর। সবাই বলছে বামুনের ছেলে, ভদ্দর-লোকের ছেলে এই বয়সে নেশা ভাঙ করা কি? ছিঃ। তোর কি লজ্জাও নেই বাবা? কি হয় ঐ গুলো সব গিলে?

তপাই বলল—আমি তোমার পা ছুঁয়ে আর বাবা তারকেশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি আজ থেকে ওসব আমি একদম ছোঁব না। তাছাড়া সত্যি কথা

বলতে কি আমি আজ আছি কাল নেই। আমিও বুঝি এগুলো খারাপ। শুধু শুধু আমার জন্যে তোমরা কেন বদনামের ভাগী হবে। তার চেয়ে ওসব আর একদমই ছোঁব না আমি।

পিসেমশাই বললেন—আজ আছি কাল নেই মানে? সারাজীবন থাক না তুই এখানে। খা দা, জমি জমা দেখা শোনা কর। তোর বিয়ে থা দিয়ে ঘর সংসার করে দেবো আমরা। অযথা বয়ে যাবি কেন? জীবনটা কি ছেলেখেলার জিনিস? জীবনের দাম নেই?

তপাই বলল—ঠিক বলেছেন পিসেমশাই। আমি খুব ভুল করেছি এতদিন। এবার থেকে আমি সত্যিই ভালো ছেলে হবো। অনেক বদমায়েসি করেছি। অনেক জ্বালাতন করেছি। আর নয়। বাবা তারকনাথের দিব্যি।

তপাই সকাল থেকে আর ঘর থেকেই বেরল না। সারাটা দিন শুধু ঘুমিয়েই কাটাল।

বিকেলবেলা একবার শুধু একা একা দীঘির পাড়ে বেড়াতে গেল।

এমন সময় কেষ্ট মালিকের সঙ্গে দেখা। কেষ্ট মালিকের বয়স হয়েছে। তা ষাট পঁয়ষট্টি তো বটেই। মাথা ভর্তি টাক। রোগা খেঁকুরে চেহারা। ঘরামির কাজ করে। তপাইকে দেখেই ডাকল—তপা, তপারে!

তপাই এগিয়ে গিয়ে বলল—কি ব্যাপার কেষ্টদা, তুমি এখানে?

—এই কাজ থেকে ফিরে চান টান করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। তা তুই এখানে একা একা কি করছিস?

তপাই বলল—সবে ঘুম থেকে উঠলুম। কাল অনেক রাতে শুয়েছি। ভালো ঘুম হয়নি।

কেষ্টদা বলল—তা হ্যাঁরে, কি সব যেন শুনাছলুম,

তোরা নাকি বাঁধের ধারে ঐ শ্মশান ঘরে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলি ?

—ভূত কি তা জানি না কেষ্টদা। তবে এই এই ব্যাপার হয়েছিল। বলে তপাই সব কথা খুলে বলল কেষ্টদাকে।

কেষ্টদা তো হেসেই অস্থির। বলল -ওরে পাগল, ওটা হ'ল জীবদান কাঠ। এক এক রকম গাছের কাঠ থাকে যেগুলো আপনা আপনি নড়াচড়া করে। তাতে ফার্ণিচার করে ঘরে বসালেও সেটা ঘটাং ঘটাং করে শব্দ করবে। নয়তো একটু একটু করে স্থানান্তরে সরে যায়। আমার মনে হয় ঐ ঘরের খিল বা দরজা জানালাগুলো সম্ভবতঃ ঐ কাঠের।

তপাই বলল—যে কাঠেরই হোক। বেশ রহস্যময় ব্যাপার।

—কাচকলা।

—না কেষ্টদা, আমি নিজে চোখে দেখেছি।

—গুষ্টির মাথা। কিছু নেশা-টেশা করেছিলি ?

—তা একটু করেছিলুম। তবে বেশিরকম কিছু নয়। জ্ঞান ছিল। তাছাড়া বৃষ্টিতেও ভিজেছি খুব। কাজেই নেশার ঘোরে নয়। সত্যিই দেখেছি।

কেষ্টদা একটু গম্ভীর হয়ে বলল—দেখ, তুই আমার ছেলের বয়সি। সহরে থাকিস। আর আমি এই গ্রামে ঘরে মানুষ হয়ে এত বড়টা হলাম। আমার তিনটে মেয়ে সাতটা ছেলে। কিন্তু আমি কখনো ভূত দেখলুম না, আর তোরা সেদিনের ছেলে ছোকরারা এসে যা বলবি তাই বিশ্বাস করে যাব ? আমি এখনো বলছি ভূত নেই। ওসব তোদের মনের ভ্রম।

—তুমি যদি বিশ্বাস না করো তো কি বলব কেষ্টদা। ভূত আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু কাল যা দেখলুম তাকে অবিশ্বাস করি কি করে ?

কেষ্টদা বলল—যাক। মরুক গে। ভূত থাকুক আর না থাকুক তাতে তোরই বা কি আমারই বা ক ? তা তুই যখন আছিস তখন একা একা কেন খাই। বেশ কটকট করে শোল মাছের ঝাল তৈরি করিয়ে এনেছি। আয়, তাই খেতে খেতে দুজনে একটু করে গলা ভিজাই।

—না কেষ্টদা। ওসব আমি আর খাবো না। এবার থেকে আমি ভালো ছেলে হবো। বাবা তারকনাথের দিব্যি দিয়েছি আমি। তার চেয়ে বরং তুমি খাও আমি দেখি।

কেষ্টদা ভুরু কুঁচকে বলল—তার মানে ?

—বললুম তো। এবার থেকে আমি ভালো ছেলে হবো।

—ভালো ছেলে হবি ? তাই যদি হবি তো খারাপ ছেলে হতে গিয়েছিলি কেন ? কপালে 'আগ' মার্কা ছাপ মেরে এখন ভালো হতে চাইছিস ? খা বলছি।

—না। ওসব আর খাবো না। পিসিমা খুব বকাবকি করছিল। পিসেমশাইও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে আজ।

—সেইজন্যে খাবি না !

- হ্যাঁ। সেইজন্যে আমি বাবার দিব্যি দিয়েছি। আর ছোঁব না ঐসব।

—তাহলে এক কাজ কর। বাবাকে বল, বাবা আজকের দিনটা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আজ খাই। কাল থেকে আর খাবো না।

—খেলেই কিন্তু ওরা জানতে পারবে।

—এখন ঘরকে যাবার দরকারটা কি ? ঢ্যাঁটামো করিস না। একটু বোস। সন্ধ্যেটা উত্তীর্ণ হোক। বেশটি করে খেয়েদেয়ে রাত করে ঘরে যাবি। এখন এইখানে ঘাসের ওপর আরাম করে

শোঁ দিকিনি।

আবার মাথার পোকা নড়ে উঠল।

কেষ্টদার সঙ্গে দীঘির পাড়ে বসে গল্প করতে করতে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। তারপর অন্ধকার একটু গাঢ় হলে একটা গাছতলায় যেখানে কেষ্টদা ওর নেশার জিনিস কলাপাতায় ঢেকে রেখে দিয়েছিল সেখানে এগিয়ে গেল। তপাইও গেল সঙ্গে। তারপর শুরু হ'ল পান ভোজনের পালা। একটু করে গলা ভিজোয় আর শোল মাছের ঝাল খায়। আঃ কি অপূর্ব।

দমভোর খেয়ে নেশায় চুর হল দুজনেই। কেষ্টদা হঠাৎ বলল—তপাই একবার যাবি সেখানে?

—কোথায়?

—ঘোগের বাসায়।

—ঘোগের বাসা! সেটা আবার কোনখানে?

কেষ্টদা রসিকতা করে বলল—হুঁ হুঁ। বুঝলি না তো। বাঘের গ্রামে ঘোগের বাসা। মানে সেই শ্মশান-ঘরে ভূতের ডেরায়।

—অর্থাৎ কাল যেখানে গিয়েছিলুম?

—হ্যাঁ। আজ আমি আছি সঙ্গে। দেখিতো কে এসে দরজা জানলা খোলে। ঐ দরজার খিল যে খুলবে তার খাল আমি খেঁচে দেবো একেবারে। চলতো দেখি।

তপাই বলল—ঠিক বলেছ কেষ্টদা। আজ তো আর ঝড়-জল নেই। আজ দেখবো খিল কে খোলে। ভূত তো ভূত, ভূতের বাপের নামও ভুলিয়ে দেবো আজ।

—চল তবে।

—চলো।

—তুই আমার পেছনে থাক। আমি সামনে। আমি ইঞ্জিন হই। তুই রেলের কামরা। আমি কু-ঝিক ঝিক শব্দ করতে করতে এগোব আর তুই ঘটাং ঘটাং শব্দ করবি। ঠিক মনে করবি যেন আমরা মার্টিন কোম্পানীর রেলগাড়ি।

তপাই বলল—বহুৎ আচ্ছা। তুমি স্টার্ট দাও আগে।

কেষ্টদা নেশার ঘোরে খুব জোরে মুখ দিয়ে আওয়াজ করল—কু-উ-উ-উ-উক্। তারপর শুরু করল—ভকস্ ভক্, ভকস্ ভক্, ভক্ ভক্ ভক্ ভক্ ভক্ ভক্।

তপাইও তখন তপাইয়ের মধ্যে নেই। সেও আনন্দে মশগুল হয়ে বলতে লাগল—ঘট ঘট ঘটাং। ঘট ঘট ঘটাং।

নড়ে উঠল দুজনেই। তারপর চলা শুরু করল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর তেড়ে ছুটে দু'তিন বার আছাড় খেয়ে পড়ল। তাতেও চেতনা নেই। ছুটল।

বাঁধের ধারের শ্মশান দীঘির পাড় থেকে প্রায় মাইল খানেকের পথ। ওরা এইভাবে গিয়ে এক-সময় সেই শ্মশান-ঘরের কাছে পৌঁছুল। তারপর দুজনে সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শুরু করল ভূতেদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালাগালি। কেষ্টদা একে মিস্ত্রী মানুষ। তার ওপর নেশার ঘোরে তার মুখ দিয়ে এমন সব ভাষা বেরোতে লাগল যে তা বলার নয়। কেষ্টদার মুখ আর পায়খানা এক হয়ে গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে গালাগালি করার পর একসময় কেষ্টদা থামল। তারপর বলল দেখি বাবা ভূতের পো, কত মায়ের দুধ খেয়েছ তুমি। আমার নাম কেষ্ট মালিক। হিম্মৎ থাকে তো আমাকে আটকাও দেখি। বলেই দরজায় মারল এক লাথি।

দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। কাজেই কেষ্টদার লাথিতে কিছুই হল না। বরং কেষ্টদাই পায়ে ব্যথা পেল একটু।

তপাই বলল—তুমি বুড়ো মানুষ। তুমি পারবে না কেষ্টদা। আমি কেমন লাথাই দেখো একবার। বলেই সারল এক লাথি।

কিন্তু না। সে লাথিতেও কিছু হ'ল না।

ওরা দুজনে তখন প্রাণপণ শক্তিতে গায়ের জোরে ঠেলতে লাগল দরজাটা। দরজা তবুও খুলল না।

কেষ্টদা বলল—আমার মনে হয় দরজাটা ভেতর থেকে খিল দেওয়া। কেউ ভেতরে বসে আছে নিশ্চয়ই খিল দিয়ে বসে বসে মজা দেখছে। ঠিক আছে। আমারও নাম কেষ্ট। দিচ্ছি দরজায় শিকল দিয়ে। বলে যেই না দরজায় শিকল দিতে যাবে অমনি দরজাটা আপনা থেকেই দুহাট হয়ে খুলে গেল।

ওরা দুজনে তখন খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখল একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

কেষ্টদা বলল—ঝোলো বাবা, একেবারে বৃন্দাবনের কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে ঝোলো। তা এত যে লাথি মারলুম দরজায় এত দেরি করলে কেন খুলতে ?

তপাই বলল—দেরি করুক আর যাই করুক। শেষ পর্যন্ত খুলতে হল ?

কেষ্টদা বলল—তা হল। কিন্তু দেরি ও করল কেন ? এর জবাব ওকে দিতে হবে। এতক্ষণ ধরে ধাক্কা-ধাক্কি করার একটা মেহনৎ নেই।

তপাই বলল—কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন রে ? বল কেন দেরি হল ?

কেষ্টদা বলল—না বললে ঐ দড়িতেই ঝুলতে হবে সারা জীবন। ওখান থেকে নামাচ্ছি না আমরা। চেল্লে চেল্লে গলা ফেটে গেল। আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি ?

তপাই বলল—ঠিক আছে। কথা না বলে না বলবে। অত গরজ আমাদের নেই। কেষ্টদা, চলো তো আমরাও জব্দ করি ব্যাটাকে।

কেষ্টদা বলল—কি করে জব্দ করি বলতো ?

তপাই বলল—ও যেমন ঝুলছে ওকে তেমনি ঝুলতে দাও।

—তারপর ?

—তারপর ? তারপর আমরা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজায় শিকিল দিয়ে পালাই চলো। দেখি ও ব্যাটা কি করে ঘর থেকে বেরোয়।

কেষ্টদা বলল—হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস তুই। আমরা শিকল দিয়ে পালাই আর এ ব্যাটা ঘরে আটকে থাকুক। এই বলে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে যেই না আসতে যাবে অমনি একটা কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। সেই সঙ্গে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া। আর তার পরই পাশের একটা আম গাছের মোটা ডাল সশব্দে ভেঙে পড়ল কেষ্টদার মাথায়।

[চলবে]

দুঃসাহসী কিশোর

অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়

টেকসাস অঞ্চলে টরেণ্টো নামে একটা জায়গা আছে।

ছোট্ট গ্রাম। লোকসংখ্যা সাতশ হবে। পাহাড় ঘেরা টরেণ্টো। মাঝখানে অনেকটা সমতল জমি। টরেণ্টোর দু'পাশে দুটি সহরতলী। লোকবসতি ভালই এবং ব্যবসাপত্তর মোটামুটি জমজমাট। টরেণ্টোতে গমের চাষ হয়। প্রচুর ফলন হয়। কিছু লোকের হাতে তাই দুটো পয়সা আছে।

আলফ্রেড ফার্গুসন নামে এক ভদ্রলোক টরেণ্টোতে একটি মুদীর দোকানের মালিক। অল্পজমি এবং দোকান থেকে যা আয় হয় সংসারের তিনটি প্রাণীর মোটামুটি ভাবে চলে যায়। তিনটি প্রাণী বলতে তিনি নিজে স্ত্রী এলিজা এবং পনেরো বছরের ছেলে রিচার্ড। স্থানীয় লোকেরা রিচার্ডকে রিচি বলে ডাকে। গ্রামের গ্রামার স্কুলে পড়ে। খুব মেধাবী ছেলে এই রিচি। স্বাস্থ্যও বেশ মজবুত এবং পরিশ্রমী। রিচির বাবা আলফ্রেড খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দোকানও প্রায় বন্ধ। স্কুল থেকে ফিরে রিচি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য দোকান খোলে বেচাকেনার জন্য। একদিন রিচির বাবা আলফ্রেড বললো আড়তদারকে দু'হাজার ডলার দু'একদিনের মধ্যে পৌঁছে না দিলে দোকানের মালপত্তর আর সে দেবে না। কথার নড়চড় হবার উপায় নেই। আড়তদার এক কথার মানুষ। স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী এলিজা বললো তোমার আড়তদার তো কুড়ি মাইল দূরে থাকে?

—হ্যাঁ, আলফ্রেড বললো।

—তুমি অসুস্থ। কি করে টাকাটা দিতে যাবে?

—তাই তো ভাবছি।

—ভাবাভাবির কি আছে? একটা চিঠি লিখে দাও তোমার অসুখের কথা জানিয়ে। ভাল হয়ে গেলে টাকাটা দিয়ে আসবে পরে। এলিজা বললো।

—এত সহজ যদি হোত তাহলে আমি ভাবছি কেন? মা-বাবার মধ্যে যখন এসব কথা হচ্ছিল রিচি তখন পাশের ঘরে বসে সব শুনছিল। রাতে খেতে বসে রিচি সেই কথাটা তুলে বললো—বাবা অমি আড়তদারকে ঐ টাকাটা দিয়ে অসবো?

—তুই কি ক্ষেপেছিস রিচি? এতটুকু ছেলে। মাত্র পনেরোটা বয়েস। ওই টেকসাস অঞ্চল কি সাংঘাতিক জায়গা তুইও জানিস। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলে তুই প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পারবি ভেবেছিস? মা বললো।

—তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ। আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি। পিস্তল চালাতেও মোটামুটি জানি মা। পনেরো বছর কি কম হোল! আমি ঠিক পারবো দেখে নিও।

—সত্যি তুই পারবি? বাবা জিজ্ঞেস করলো।

—কেন পারবো না বাবা?

পরের দিন ভোরে রিচি ঘোড়ায় চাপলো বেশ মুরুব্বি চালে। মা সজল নয়নে ছেলেকে বিদায় জানালেন মঙ্গল কামনা করে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। হঠাৎ উইণ্ডমিলের কাছে রিচি শুনতে পেল কে যেন মেয়েলি কণ্ঠে রি-চি রি-চি বলে ডেকে উঠলো। হাতে ফুলের ডালি নিয়ে ন্যান্সি ছুটে আসতে লাগলো। ন্যান্সি রিচির সহ-পাঠিনী।

—কি ব্যাপার রিচি? ডিউকের মতো ভারিক্কী চালে এই সাত সকালে কোন রাজ্য জয় করতে যাওয়া হচ্ছে শুনি? এর আগে কোনদিন তোমাকে এ দৃশ্যে দেখিনি?

—যাচ্ছি একটা জরুরী কাজে। ফিরবো পরশু দিন। রিচি বললো।

—কোথায় জানতে পারি? ন্যান্সি জিজ্ঞেস করলো।

—যাচ্ছি পিসীর কাছে। বাবার অসুখের খবর দিতে। বাবার তো ঐ একটি মাত্র বোন। রিচি মিথ্যে করে বললো।

—তুমি ওই পাহাড়ি দুর্গম পথ চিনে যেতে পারবে তো? ন্যান্সি জিজ্ঞেস করলো?

—তুমি আমায় কি ভাব বলতো? আমি কি তোমার মতো মেয়ে?

- খুব যে বড়াই হচ্ছে। দেখা যাবে। এই বলে ন্যান্সি তার ডালি থেকে একটা লিলিফুল রিচিকে দিয়ে শুভেচ্ছ জানালো।

রিচি এবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রিচির ঘোড়া ছুটতে লাগলো। কোথাও কোথাও ঝিরঝির করে ঝর্ণা নেমে আসছে পাহাড়ের বুক দিয়ে। সুন্দরী সুন্দরী নারীদের গান রিচিকে যেন একটা অন্য জগতে নিয়ে যেতে লাগলো। পথে কয়েকজন ভবঘুরে টেকসানের সঙ্গে দেখা হোল। সবাইকে, রিচি বলতে লাগলো তার বাবার অসুখের খবর দিতে পিসীর কাছে যাচ্ছে।

হঠাৎ রিচির মনে হল যে অন্যমনস্কতার জন্য ভুল পথে এসে পড়েছে। তার বাবা পথের যে সব নিশানা দিয়েছিল তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না। এ জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। হয়তো আশেপাশে রেড ইণ্ডিয়ানরাও থাকতে পারে। শ্বেতাঙ্গদের তারা সর্বদাই সন্দেহ করে। রিচির মনে ভয় ঢুকতে লাগলে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল রিচি। ঘোড়া অন্য পথে ছুটতে লাগলো। এদিকে পাহাড়ের মাথা থেকে

সূর্য অদৃশ্য হবার উপক্রম করছে। ঠাণ্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়তে শুরু হয়েছে। নির্জন গিরিপ্রান্তর যেন একটা ভৌতিক পরিবেশে পরিণত হতে শুরু করলো।

রিচি একটা পুলিস ফাঁড়ির সামনে ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লো। মনে মনে ভাবলো ঈশ্বর তাকে এই নিরাপদ আশ্রয়টা আজ রাতের জন্য পাইয়ে দিয়েছেন। আগামীকাল সকালে নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যাবে। রিচি থানার অফিসে প্রবেশ করলো। ঘরে একজন অফিসার ও কয়েকজন সিপাই ছিল। রিচি তার সব সত্যি কথা জানিয়ে রাতটুকুর জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করলো। অফিসার রিচির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন খুঁটিয়ে দেখে আশ্রয় দিলেন। রিচিকে একটা ঘর দেওয়া হোল। রিচি অফিসারের মুখে শুনলো এখান থেকে তার গন্তব্যস্থল বেশী দূরে নয়।

রিচি কম্বলের তলায় শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না নতুন জায়গা বলে। হঠাৎ রিচি পাশের ঘরে দু'জন মানুষের কথা শুনতে পেল। ওরা পরামর্শ করছে আর একটু রাত হলে তারা তাকে খুন করে একেবারে কম্বলশুদ্ধ কবর দিয়ে দেবে। আর রিচির কাছ থেকে যে টাকাটা পাওয়া যাবে তা দু'জনে সমান ভাগ করে নেবে।

প্রায় শেষ রাতে দু'জন সিপাই রিচির ঘরে ঢুকে কম্বল সুদ্ধ চ্যাংদোলা করে বাইরে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাথর ও মাটি চাপা দিয়ে দিল। তারপর রিচির ঘোড়ার পিঠে ব্যাগটা খুলে একটা গাছের নিচে পুঁতে রাখলো।

এদিকে বেশ বেলা হয়ে গেছে। অফিসার রিচিকে ঘরে দেখতে না পেয়ে ভাবলো নিশ্চয়ই ভোরে এদিক-ওদিক কোথায় বেড়াচ্ছে। ঘোড়াটা তো রয়েছে। বাচ্ছা ছেলেদের কতরকমই না দুরন্তপনা থাকে।

আরও একটু বেলা হতে একজন সিপাই এবং দু'জন অফিসারকে নিয়ে রিচি তার রাতের জায়গায় ফিরে এলো। বড় থানার অফিসার জিজ্ঞেস করলো আপনার থানার সব সিপাইদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলুন। নির্দেশ মতো ছোট থানার সব সিপাই লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

—আপনার থানায় ক'জন সিপাই ছিল। বড় থানার অফিসার জিজ্ঞেস করলো।

—বাইশ জন। ছোট থানার অফিসার বললো।

—ক'জন আছে।

—একুশ জন দেখছি সার।

—আর একজন কোথায় ?

কেউ বলতে পারে না। রিচি বড় সাহেবকে নিয়ে সেই গর্তের কাছে এসে দাঁড়ালো। গর্ত খোঁড়া হোল। সিপাইয়ের লাস পাওয়া গেল। যারা খুন করে ছিল রিচি তাদের ধরিয়ে দিয়ে যে গাছের নিচে রিচির ব্যাগটা পুঁতে রাখা হয়েছিল তা বার করলো। এবার রিচি ছোট থানার অফিসারের উদ্দেশ্যে বলল আমার ঘুম আসছিল না। পাশের ঘর থেকে দু'জন সিপাইয়ের সংলাপ শুনতে পেয়ে ছিলুম। ওরা তাকে খুন করার পরামর্শ করে টাকাটা আত্মসাৎ করতে ঠিক করলেন। আমি ভয় পেয়ে ঘরের জানালা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গাছে উঠে বসি। কিছুক্ষণ পর ডিউটি থেকে এক সিপাই এসে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। খুনী সিপাইরা আমায় ভেবে তাদের কম্বলে ঢাকা সিপাইকে তুলে মাটি চাপা দিয়ে দেয়।

রিচি বড় থানার অফিসারের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়ে তার গন্তব্যস্থলে গিয়ে বাপের টাকাটা আড়তদারকে দিয়ে মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে টরেন্টোতে ফিরে এলো রিচিকে ফিরতে দেখেই ন্যান্সি একমুখ হেসে রিচিকে একগুচ্ছ লিলি ফুলে উপহার দিল।

ফাঁদ পাতা ছিল

পুলক দেবনাথ

বাণ্টুরা সপরিবারে মেজকাকুর বিয়েতে শ্যামবাজার গেছে। বাড়িতে কেউ নেই। একমাত্র পোষা ময়না মিতুয়া ছাড়া। বাণ্টু অবশ্য তার প্রিয় মিতুয়াকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার গোঁ ধরেছিল। কিন্তু বাবা, মা, দাদা কেউ তার আব্দার পূরণ করতে রাজি হয় নি। একবাক্যে সকলেই 'না' করে দিয়েছে। অগত্যা একাই মিতুয়াকে বাড়িতে থাকতে হল।

আর এর সুবর্ণ সুযোগ নিল দু'-দু'টো পাকা ছোক্‌রা চোর। অন্ধকারে গা ডুবিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে ওরা বাড়ির চৌহদ্দিতে পা ফেলল। তারপর গুটি গুটি করে বারান্দায় উঠে দরজার তালা ভেঙে সোজা ঘরে।

ঘরে ঢুকতেই মিতুয়ার সাদর সম্ভাষণ ধ্বনিত হল মোলায়েম স্বরে—'কে, বাণ্টু এলি ?'

চোর দু'টো ভীষণ চমকে উঠল। কে বললে কথাগুলো ? তবে কী ঘরের মধ্যে কেউ রয়েছে ?

একটি সাহসী চোর চকিতে কোমর থেকে চকচকে ছোরাটা হাতের শক্ত মুঠিতে তুলে নিল। অপরজন তিন ব্যাটারী টর্চের দুরন্ত ফোকাস ফেলল ঘরময়। হঠাৎ এক জায়গায় এসে ফোকাস স্থির হল। টর্চের তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হল টেবিলের উপর রাখা একটি খাঁচায় আবদ্ধ ময়না মিতুয়া তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে পিটপিট করে।

মিতুয়া ফের বলে উঠল, বাণ্টু এলি ?'

চোর দু'টো এবার হি-হি করে হেসে উঠল। ভারী মজা তো ! একটা পাখি কি সুন্দর কথা বলছে। রসিকতা করতে ছাড়ল না একটি চোর। খাঁচার সামনে গিয়ে সহাস্যে বলল, 'ওহে পক্ষীমশাই ! আমরা কেউ বাণ্টু নই। আমার নাম হল তো ঝুলন। আর আমার সাথে যে রয়েছে, তার নাম ভুলন। আমরা ঝুলন-ভুলন।'

হঠাৎ মিতুয়া অস্থিরভাবে ঘুরতে লাগল খাঁচার চারপাশে। আর খাঁচার তার কামড়াতে লাগল। একসময় স্থির হল। তারপর কিসব যেন উচ্চারণ করার চেষ্টা করল নানা সুরে।

মিতুয়ার কাণ্ডকারখানা দেখে তো চোরটি খুশিতে ডগমগ। দৃষ্টি এখন তার এদিকেই নিবদ্ধ। চৌর্যকর্ম বেমালুম ভুলে বসে আছে।

কিন্তু অপর চোরটি ভীষণ সতর্ক। তাই সে তাড়া দিল, কিরে চুরি করতে এসে দেখি পাখিটার সঙ্গে তামাসায় জুড়ে গেছিস। কি কি নিবি, চট্‌জলদি নিয়ে নে ! নইলে নির্ঘাৎ দফা রফা হবে।'

তাড়া খেয়ে প্রথম চোরটি সজাগ হয়।

অতঃপর দুই চোর সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে দামী দামী জিনিসপত্তের খোঁজ শুরু করে। ভাল ভাল জামা-কাপড়, থালা-বাসন, ঘড়ি-রেডিও, বাণ্টুর মা'র দশ-বার ভরি সোনার গহনা আর শ' পাঁচেক টাকা সব ব্যাগে পুরল।

একটি চোর টেলিভিসটনটাও ছুঁয়ে দেখল। 'ভাল হিন্দী সিনেমা আছে রে আজ! দেখে যাবি?'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোর?' অপর চোরটির চটপট সাবধান বাণী। 'যদি এক্ষুনি বাড়ির লোক-জন এসে পড়ে? তার চে' এটাকে নিয়েই চ'।

'সেই ভাল। তার আগে চ' রান্নাঘরটায় ঘুরে আসি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

রান্নাঘরে গিয়ে চোরেরা কোন তৈরি করা খাবার পেল না। পাবে কী করে? বাণ্টুরা তো আজ মেজকাকুর বিয়েতেই ভাল ভাল খানাদানা সারবে। রান্নাবান্না তাই কিছুই হয়নি। তবে পাওয়া গেল এক ডেকচি দুধ। ঢকঢক করে দু'জন তা-ই উদরস্থ করলে।

চোর দু'টো এবার খুশি মনেই চুরি করা সব জিনিসপত্তর নিয়ে বাণ্টুদের বাড়ি ছাড়ল। হ্যাঁ, যাওয়ার আগে ওরা টেলিভিসন সেটটি নিয়ে যেতেও ভুল করেনি।

তবে অসহায়ের মতো মিতুয়া খাঁচার মধ্যে ভীষণ ছটফট করছিল সে-সময়। আর নানা বুলি ছাড়-ছিল।

সেদিন বেশ রাত করেই বাণ্টুরা বাড়ি ফিরল। দরজায় হাত দিতেই ওদের মাথায় হাত। ঘরে ঢুকে দেখল, সব দামী দামী জিনিসত্তর চোরেরা সাফ করে দিয়ে গেছে।

সব দেখে শুনে বাণ্টুর মা তো কান্নাকাটি জুড়ে দিল। দিদি কাঁদতে কাঁদতে মা'কে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মা-দিদি দু'জনেরই ভাল ভাল শাড়ি-গহনা চোর নিয়ে গেছে।

বাণ্টুর দাদা আক্ষেপের সঙ্গে শুধু বললব, 'চোরের হাত থেকে টেলিভিসনটাও নিস্তার পেল না!'

আর বাণ্টুর বাবা কিছুক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেরিয়ে গেলেন থানায় ডায়েরি করতে। সঙ্গে দাদাও গেল।

বাণ্টু ভেবে পায় না, সে এখন কী করবে! হঠাৎ মনে পড়ে তার প্রিয় মিতুয়ার কথা। শেষ পর্যন্ত চোর হাপিস করে দেয় নি তো? ছুটটে গেল টেবিলের কাছে। দেখল, না, মিতুয়া ঠিক আছে খাঁচার মধ্য থেকে জুলজুল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

বাণ্টুকে দেখে মিতুয়া যেন খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। খাঁচার মধ্যেই একটু নেচে নিয়ে বললে, 'বাণ্টু এলি?'

বাণ্টু বলল, 'হ্যাঁরে। কিন্তু আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! চোর আমাদের ঘরের সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।

সব শুনে মিতুয়া একটু ডানা ঝাপটে নিল। তারপর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'ঝুলন-ভুলন!'

আশ্চর্য! মিতুয়ার মুখে এ কি নতুন বুলি! ভারি অবাক হল বাণ্টু।

ওদিকে বাণ্টুর বাবা থানায় ডায়েরি করে দিয়ে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কুচকুচে কালো গাড়ি করে পুলিস এল। সবকিছু দেখল, শুনল। বাবাকে বলল, 'দেখুন, চোরেরা এখন খুব এক্সপার্ট! ব্যাটাদের ধরতে এখন ঘাম ছুটে যায়। তবে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।'

একথা বলে পুলিস ইন্সপেক্টর যেই চৌকাঠের বাইরে পা দিতে যাবেন, অমনি পিছন থেকে ভেসে এল: ঝুলন। ভুলন।

চুম্বকে আটকে পড়লেন যেন ইন্সপেক্টর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বললে কথাটা?'

বাপ্টু এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমাদের বাড়ির পোষা ময়না মিতুয়া।'

'ময়না! মানে একটা পাখি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমরা বাড়ির সকলে মেজকাকুর বিয়েতে গিয়েছিলাম। মিতুয়াই কেবল একা ছিল বাড়িতে। বাড়িতে ফিরে আমিও শুনছি ওর মুখে ঐ দু'টো নতুন শব্দ ঝুলন-ভুলন। আমাদের মিতুয়ায় আবার একটি বড় গুণ হল পছন্দসই নতুন শব্দ শুনে বলতে পারে।'

'আই-সী।' পুলিশ ইন্সপেক্টরের চোখ দুটো চকচক করে উঠল, যেন আলার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, 'তোমার মিতুয়া যে দুটো নাম এইমাত্র বলেছে, তারা দুই ভাই এই অঞ্চলের দাগী আসামী। থানায় এদের নামে চুরি-ছিনতাই-ডাকাতির বহু কেস আছে।'

'তাই না কি!' বাপ্টু পট করে বলে ফেললে, 'তাহলে কী আমাদের বাড়িতে চুরিতেও ঝুলন-ভুলনের হাত আছে? এখানে এসে হয়ত ওরা কোন কারণে নিজেদের নাম প্রকাশ করে ফেলেছিল। আমাদের মিতুয়া তা শুনে শিখে ফেলেছে! আর এখন তা-ই উচ্চারণ করেছে!'

'এগ্‌জ্যাক্টলি। আমারও তাই মনে হয়।' পুলিস ইন্সপেক্টরও সুরে সুর মেলালেন। 'আচ্ছা চলি। আশা করি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একটা শুভসংবাদ দিতে পারব। ডোণ্ট ওরি!'

পুলিস ইন্সপেক্টর তার দলবল নিয়ে চলে গেলেও। ঘণ্টা খানেকও লাগেনি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই থানা থেকে লোক এসে জানিয়ে গেল: ঝুলন, ভুলন ধরা পড়েছে তাদের বাড়িতেই। ধরা পড়ার সময় ওরা চুরি করা মালপত্র বাইরে পাচার করার ব্যবস্থা করছিল। এজন্য পুরো কৃতিত্ব বাড়ির পোষা ময়না মিতুয়ার।'

সব শুনে বাপ্টু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—ভাগ্যিস মিতুয়া বাড়িতে ছিল। ফাঁদ তাহ'লে পাতাই ছিল!

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিজ্ঞানের অবদান। আজকাল কিশোর থেকে তরুণ ছাত্রদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল জাগানোর জন্য আগামী সংখ্যা থেকে একটা 'ম্যাজিকের মজা' ফিচারে আগ্রহীদের মনে অনুসন্ধিৎসা এনে দেব।

সত্যি কথা বলতে কি, বটুরামের এমন ভাবে স্থান ত্যাগের ইচ্ছে আদৌ ছিল না। জীবনে অনেক কিছু কাজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে করতে হয়েছে। কারণ ঐ ওটুরাম।

যতই হোক, বাপ-মা মরা ভাই। যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্য ইচ্ছা-অনিচ্ছার একটু আধটু হের-ফের করা প্রয়োজনও ঘটে। তবে আর ভালবাসা কেন বলি। পথে বেরিয়ে ওটুরাম বলে, 'দাদা' নাকে সুড়সুড়ি দেবার চন্দন কাঠিটা নিয়েছো? নাক বুজে গেলে সুড়সুড়ি দিতে লাগে তোমার।'

'ওটা তোর পকেটে।' ওটুরাম বলে।

'আমার পকেটে?'

'হ্যাঁ। আমার ভুল হলেও তোর ঐ রঙ-চঙে জামাটা পরতে তুই ভুল করিস না। অতএব সহজেই হাতের কাছে পেয়ে যাবো।'

'সত্যি দাদা, তোমার বুদ্ধি আছে।' বটুরাম হাসিমুখে গদ-গদ ভাব প্রকাশ করে।

বটুরাম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে

জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁরে বটু, যাযাবরের মতো বেরিয়ে তো পড়লাম। প্রথমে কোনদিক প্রদক্ষিণ করবি একবার ভেবে দেখেছিস?'

'দক্ষিণে চল দাদা। তুমিই এক-সময়ে বলেছিলে, দক্ষিণস্থ যাত্রা শুভ। অতএব—'

'ঠিক বলেছিস।' বলেই বটুরাম পকেট থেকে কাজুবাদাম বার করে ওটুরামের হাতে দিয়ে বলে, 'ছুটো চিবিয়ে নে।' হাত বাড়িয়ে ওটুরাম সেগুলো গ্রহণ করে আপন মনে চিবোতে থাকে। এরই ফাঁকে বটুরাম আওড়ে যায়, 'দেখ ওটু, তোকে মানুষ করে আমি আর এ-সংসারের রাজ্যে থাকবো না। বনবাসী হব। শাস্ত্রে আছে, চল্লিশ ঊর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। কোনরকমে চল্লিশের মাথায় এসে দাঁড়াই—'

'দাঁড়াবার আগেই যদি খসে যাও?' ওটুরামের পাল্টা প্রশ্ন।

'খসে যাই মানে?'

'ছাখ দাদা, মানুষের জীবনের কথা কে বলতে পারে। এই আছ এই নেই।'

'কোথায় যাব শুনি?' বটুরামের স্বর চড়তে থাকে। 'তুই আমার এমনই ভাই? এখন থেকেই মৃত্যু কামনা করছিস?'

'তুমি ঠিক কথাটা বুঝলে না

দাদা—' বটুরামকে শান্ত করতে চায় ওটুরাম। বলছিলাম'

'থাক, তোকে আর কিছু বলতে হবে না।' বটুরাম তার ভাইকে থামিয়ে দেয়। ওটুরামের মুখেও আর তেমন বিশেষ কথা শোনা গেল না।

দু'জনেই মৌন হয়ে পাশাপাশি চলে। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে এসে নিজের কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে বটুরাম গম্ভীর হয়ে বলে, 'এবার এটাকে তুই একটু নে। দেখিস সাবধানে চলবি। তোর তো আবার হাত-পায়ের ঠিক নেই।'

ওটুরাম ঝোলাটাকে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে থাকে। বটুরাম উপদেশ আওড়ে বলে, 'আমরা কোথায় চলেছি কে জানে! জন্তু-জানোয়ারেরও যাওয়া-আসার একটা লক্ষ্য থাকে। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবো ভগবানই জানেন।'

'তুমি তো বললে দক্ষিণে যাব।' ওটুরাম দাদাকে মনে করিয়ে দেয়।

চলতে চলতে থেমে যায়। গালে বটুরামের হাত পড়ে। চোখ-মুখ ঘাড় ফিরে এদিক-ওদিক দেখে নেয়। অতঃপর জিজ্ঞেস করে, 'হাওয়াটা কোথা থেকে বইছে বল তো?'

ওরটুামও দাদার কথায় হাওয়ার দিক নিরীক্ষণ করতে থাকে। প্রবাহিত হাওয়ার দিক ঠিক করতে সেও বিফল হয়। গুন-গুনিয়ে বলে ওঠে, 'তার চেয়ে চল দাদা, গড়ের মাঠে গিয়ে দাঁড়াই। হাওয়ার গতি কোন-দিকে ধরা পড়ে যাবে।'

'এই আবিষ্কার করতে পারলি না, তুই আবার—' বটুরামের চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

'এটা কি একটা আবিষ্কার হলো?' ওটুরামেরও পাল্টা জবাব। 'হাওয়া যেদিকে বইবে, আমরাও সেদিকে যাব। পালের নৌকোর মতো।'

হঠাৎ ওটুরামের নজর পড়ে দু'জন হাতে লাঠি নিয়ে একপাল ভেড়াকে তাড়িয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। ওটুরামের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। দাদাকে বলে, 'পালের নৌকোর মতো না চলে ভেড়ার পালের মধ্যে মিশে গিয়ে যদি আমরা এগিয়ে চলি কেমন হয়?'

'ভেড়াগুলো যাচ্ছে কোথায়?' বটুরাম ভেড়াবৃন্দের প্রতি নজর

রেখে জিজ্ঞেস করে।

'জিজ্ঞেস করলে হয় না?'

'কাকে, ভেড়াদের?' বিরক্তবোধ করে ভায়ের দিকে টেরিয়ে দেখে নেয়।

ওটুরামও ধৈর্য হারিয়ে বলে, আহা, ভেড়াদের জিজ্ঞেস করতে যাব কেন। ওদের গাইডকে।

'ওরা কি দেশভ্রমণ করতে বেরিয়েছে যে সঙ্গে গাইড থাকবে?' 'তুমি ভুল করছো দাদা—।' ওটুরাম ব্যাপারটা শুধরে দিতে চেয়ে বলে, 'ওদের পিছনে যে দু'জন লোক এগিয়ে আসছে, ওরাই হলো গিয়ে ওদের গাইড।'

বটুরাম এবার যথাস্থানে দৃষ্টি রাখলো। হ্যাঁ, দুজন আছে বটে ওদের পিছনে। ও মা! সামনেও একজন। একটা ভেড়ার কান পাকড়াও করে টানতে টানতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সঙ্গে ভেড়া-বৃন্দরা তাকে অনুসরণ করে চার পায়ের পদক্ষেপে কোনভ্রূক্ষেপ না করে সবার দুলিয়ে দুলিয়ে বাকীরা সব চলতে থাকে! ইতিমধ্যে দাদাকে পিছনে ফেলে রেখে ওটুরাম ভেড়াদের পালে মিশে যায়। নিজেদের জাত ছাড়া অন্য কেউ তাদের মাঝে এসে পড়লেও ভেড়াগুলোকে ভ্রূক্ষেপ করতেদেখাযায় না। বাধা পেলেই কখনো গুঁতো আবার কেউ কেউ অভদ্রের মতো পা মাড়িয়ে চলে যায়। ভাইয়ের বিপদ দেখে বটুরাম এগিয়ে এসে সেও ভেড়ার পালের মধ্যে পড়ে এবং ওটুরামের মতো দুর্দশায় পড়তে হয়। ভেড়াদের পদদলিত হয়ে অবশেষে গাইডের দ্বারা নিস্তার মেলে। হাঁফাতে হাঁফাতে বটুরাম বলে, 'তোমার ভেড়াগুলো বড় অসভ্য। সব যেন লড়াই করতে চলেছে। তুমি ভাই এদেরকে নিয়ে সামলাও কি করে?'

'ভেড়াদের মধ্যিখানে কখনো পড়তে নেই। না হয় আগে অথবা পিছনে থাকতে হয়।'

ওটুরাম বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছো। ভেড়াদের পিছনে থেকে অনুসরণ করার কথা ছিল। থাকলে ওরা দাদাকে এবং আমাকে এভাবে অপমান করতে পারতো না।'

'আচ্ছা ভাই ওরা ঠিক দক্ষিণ-দিকে চলেছে?' মাঝখান থেকে বটুরামের প্রশ্ন। ভেড়ার গাইড কি বুঝলো সেই জানে। বলে, 'আজ্ঞে সব কসাইখানায়। কাল এদের দেখতে পাবেন ছাল-চামড়া ছাড়ানো মূর্তিতে।'

'তার মানে একই হলো—' ওটু-রামও যোগ দেয়। 'যমের দক্ষিণ দুয়ারে আর কি। সর্বনাশ! দাদা এ-যাত্রায় খুব বেঁচে গেলাম। কসাইদের হাতে আমাদেরকেও পড়তে হতো। তুমি বরং তোমার মত পালটাও। আর শাস্ত্রে যাই বলুক না কেন, দক্ষিণদিক তেমন সুবিধে মনে হচ্ছে না।' ফিরে চল!···

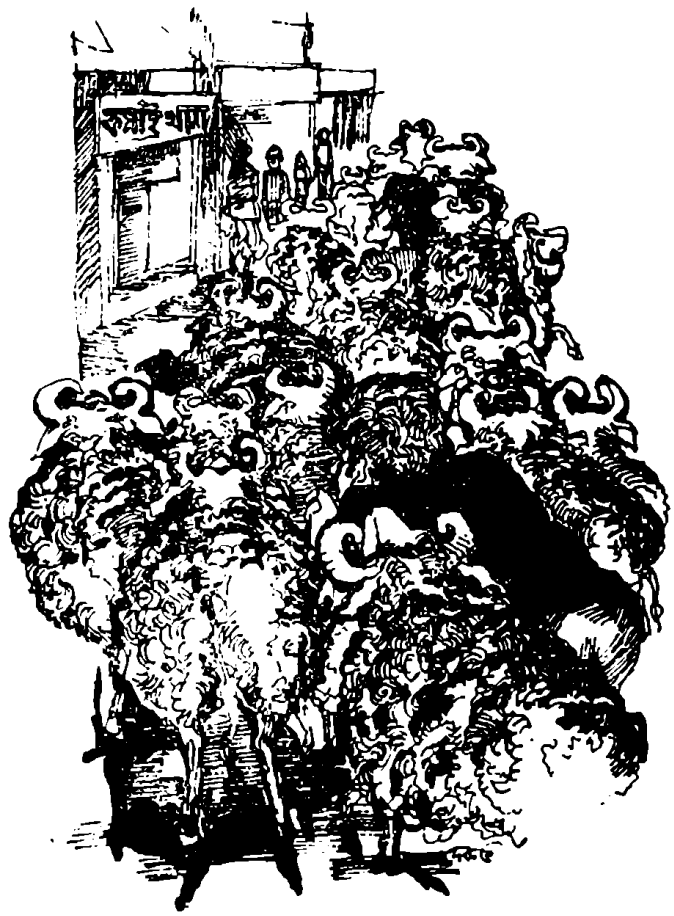

ভেড়ার পালে বটু ও অটুরাম

হান্নান আহসান

ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচ। সাসেক্স বনাম ল্যাঙ্কাশায়ার। দারুণ উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাস খেলা। পার্কাস সাহেব ব্যাট করছেন সাসেক্সের। নির্ভুল কাট, গ্লান্স, ড্রাইভ-কভার ড্রাইভ। প্রতিপক্ষ দলের তা বড় সব বোলাররা হিমসিম খাচ্ছেন, পার্কাসকে আউট করার ফন্দি আঁটছেন, বুদ্ধি ফাঁদছেন। আরো সতর্ক হ'য়ে ওঠেন সাহেব। সুযোগ খুঁজছেন উইকেট রক্ষক জর্জ ডাকওয়ার্থ। স্থির, ধীর, গম্ভীর। কোনপ্রকার কথাবার্তা বা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন না, দৃষ্টি বল আর উইকেট। অপেক্ষার পর অপেক্ষা। এল সুযোগ। পার্কাস সতর্কভাবে খেলতে গেলেন একটি বল। বোধ হয় সঠিক খেলা হল না। ভাবলেন বলটা তার ব্যাটের কানা ছুঁয়ে উইকেট রক্ষক জর্জের হাতে গেল। শুধু ভাবা নয়, দেখতেও পাচ্ছেন জর্জ তালু-বন্দী করেছে বলটা। কি আর করা! ওদিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের এগারো জনই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, হাউজ দ্যাট্। আম্পায়ারের দিকে তাকাবার দরকার নেই, সাহেব হাঁটা শুরু করলেন প্যাভিলিয়নের পথে। কিন্তু ঘটনা হল, আম্পায়ার আউট দেননি। নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান তা বুঝে নিয়ে সাহেবকে ডাক দিলেন। আর কী করা, সাহেব তো পড়ি কি মরি করে উইকেট আগলাতে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে ভীষণ দেরী হয়ে গেছে। জর্জ সুযোগ বুঝে দ্বিতীয়বার আউটের কবলে ফেলতে সাহেবের উইকেট ভেঙে দিলেন। সত্যি সত্যি আম্পায়ার এবার আউট দিলেন, আঙুল ওপরে তুললেন। ভাগ্য মন্দ, সাহেবকে ফিরে যেতে হল সেদিনের মতো। এইতো ক্রিকেট, ভুলে ভরা, রানে ভরা—মজার!

এ তো গেল একটা অদ্ভুত স্ট্যাম্প আউটের ঘটনা। এবার ভারি মজার আর দুঃখজনক আর একটা আউট। এ ঘটনাও কাউন্টি ক্রিকেটকে কেন্দ্র

(বাকী অংশ ৪০২ পৃষ্ঠা)

খেলাধুলার আসর

অজয় দাশগুপ্ত

কলকাতার জানুআরি মাসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণ নেহরু গোল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হল। এত বড় ফুটবলের আসর এদেশে এর আগে কখনো হয়নি। এর তুলনায় প্রথম ও দ্বিতীয় নেহরু কাপ নিষ্প্রভ বলতেই হয়। এক কথায় বলা চলে এটা একটা বিশ্বকাপের ছোট সংস্করণ। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল আর্জেন্টিনা পোল্যাণ্ড হাঙ্গেরী রুমানিয়া চীন ও উদ্যোক্তা ভারত। কলকতার দর্শক এক অত্যুচ্চ মানের ফুটবল খেলা দেখল যা সবদিক দিয়েই আধুনিক। সকলেই ধরে নিয়েছিল ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও পোল্যাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অসাধারণ ভাল ফুটবল খেলে চীন গোল অ্যাভারেজে আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে ফাইনালে গিয়েছিল। ফাইনালে পোলাণ্ড চীনকে ১-০ গোলে হারিয়ে এই প্রতিযোগিতা জিতে নেয়। ফাইনালের এক-মাত্র গোলটি করেন পোল্যাণ্ডের স্টপার ব্যাক রোমান ওজোস্কি। এই প্রতিযোগিতায় ভারত ১ পয়েণ্ট পেয়ে সর্বনিম্ন স্থান দখল করলেও সে কিন্তু একমাত্র চীনের বিরুদ্ধে ছাড়া সব খেলাতেই অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। যার ফলে হাঙ্গেরী চীন রুমানিয়া আর্জেন্টিনা ও পোল্যাণ্ডের প্রশিক্ষকরা এক বাক্যে ভারতের খেলার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় কোচ মিলোভান সত্যিই আমাদের ফুটবলারদের মেরুদণ্ড সোজা করে খেলতে শিখিয়েছেন। নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন হাঙ্গেরীর বিশ্বকাপ ফুটবলের লাজলো কিস! সেরা গোলকীপার ও অধিনায়কের সম্মান পেয়েছেন পোল্যাণ্ডের মিনারচিক। শ্রেষ্ঠ গোলদাতা রোমান ওজোস্কি।

এই খেলায় পুরস্কার বিতরণের জন্য ১৯৬৬র ইংলণ্ডের সফল অধিনায়ক ববি মুর এসেছিলেন। ববি মুর এই প্রতিযোগিতা দেখে খুবই খুশি হয়েছেন। যদিও তিনি ভারতের খেলা দেখার সুযোগ পাননি তবু চীনের খেলা তাঁর ভাল লেগেছে। এবং তিনি মন্তব্য করেছেন কিছু দিনের মধ্যেই চীন বিশ্ব প্রতিযোগিতায়

ভাস্কর পরমিন্দর মনোরঞ্জনকে নিয়ে চারজন

অংশ নেবে।

বিদেশী কোচদের চোখে আমাদের প্রশান্ত ব্যানার্জি পারমিন্দার বিদেশ বসু বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তরুণ দে-এর খেলা খুবই ভাল লেগেছে। কেউ কেউ বলেছেন এরা পৃথিবীর যে কোন দেশেই সুনামের সঙ্গে খেলতে পারেন।

গ্যারেফা রোমান মিলোভান

এবছরের আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক নেহরু কাপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সল্ট লেক স্টে ডি য়া মে র উ দ্বো ধ ন। স্টেডিয়ামটি দেখে কলকাতার ফুটবল পাগল মানুষ আজ তৃপ্ত। তাদের বহুদিনের আশা রূপায়িত হল নেহরু কাপকে ঘিরে। স্টেডিয়াম শেষ হলে এটি হবে এশিয়ার ভেতর সব চেয়ে সেরা স্টেডিয়াম। এবং পৃথিবীর যাবতীয় বড় স্টেডিয়ামগুলির অন্যতম।

নেহরু কাপ শেষ হতে না হতেই সাওপাওলো সুপার বয়েজ দল ভারত ঘুরে গেল। ব্যবসায়ী টাটা গোষ্ঠীর আন্তরিক চেষ্টায় এই দলটি তিনটি ম্যাচ খেলবার জন্য ভারতে এসেছিল। জুনিয়ার ফুটবলে এরাই এখন বিশ্ব চ্যা প্পি য় ন। সাওপাওলোর খেলায় পরিচ্ছন্ন ব্রাজিলীয় ঘরানার ফুটবল আমরা দেখতে পেলাম। এই দল টাটা দলকে ৩—০ গোলে এ. আই. এফ. এ. দলের সঙ্গে শেষ খেলায় ১—১ গোলে ড্র করে। শেষের দুটো খেলাতেই ভারত অত্যন্ত আধিপত্য নিয়ে খেলেছে। নেহাৎ ভাগ্যের দোষে তারা জিততে পারেনি। সাওপাওলো সুপার বয়েজের ববি ও সিডনির খেলা ভারতীয় দর্শক বহুদিন মনে রাখবে। এরা ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ।

রোভার্স কাপে ইস্টবেঙ্গলের চার খেলোয়াড় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভাস্কর গাঙ্গুলী দেবাশিষ রায় ও মিহির বসু রেফারি কুটিনহোর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে!

ভারত দলে খেলবেন বাংলার ২৬ জনের ১৬ জন

মাদ্রাজ জাতীয় ফুটবলে এবার বাংলা দলের নেতৃত্ব দেবে প্রশান্ত ব্যানার্জি। ২৩শে মার্চ নির্বাচকদের সভায় আরো পঁচিশ জন খেলোয়াড়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। ২৬ জনের মধ্যে ১৬ জনই ভারত দলের হয়ে দেশে-বিদেশে খেলেছে।

(গোলকিপার)—ডাস্কর গাঙ্গুলি, অতনু ভট্টাচার্য ও তাপস চক্রবর্তী। (ব্যাক)—পেম দরজি, কৃষ্ণেন্দু রায়, কবীর বসু, অনুদেব দাস ও স্বপন সাহারায়। (স্টপার)—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুদীপ চ্যাটার্জি, সত্যজিৎ ঘোষ ও তরুণ দে। (লিঙ্কম্যান)—প্রশান্ত ব্যানার্জি, ভিক্টর অমলরাজ, বিকাশ পাঁজি, দেবাশিস মিশ্র ও সঞ্জয় ঘোষ। (ফরোয়ার্ড)—বিদেশ বসু, বাবু মানি, সুবীর সরকার, মনোজিৎ দাস সুজিত চক্রবর্তী, কার্তিক শেঠ, কৃশানু দে, অরূপ দাস ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। (স্ট্যাণ্ড-বাই)—চন্দ্র নাথ ঘোষ, উত্তম মজুমদার, প্রদীপ সাহা, প্রদীপ ঘোষ। (কোচ)—শান্ত মিত্র। (ম্যানেজার)—মানব দত্ত।

তাই এ আই. এফ. এফ. এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তারা প্রথম দুজনকে ৩ মাসের জন্য সাসপেণ্ড করে শাস্তি দিয়েছেন। শেষোক্ত দুজনের শাস্তি হয়েছে এক বছরের। ফলে তারা আগামী ডিসেম্বরের আগে খেলতে পারবেন না। যদিও এ. আই. এফ. এফ-র এই শাস্তির বিরুদ্ধে ওই চার জন ফুটবলার হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চালু হবে না।

কলকাতার ঘরোয়া ফুটবল লীগে দল বদলের হাওয়া শুরু হয়ে গেছে। দুই প্রধানের কোচ নির্বাচন হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। মোহনবাগানে পি. কে. আসছেন, আর ইস্ট-বেঙ্গলে সেই অমল দত্ত। মহা-মেডানের কোচ-নায়িম থাকছেন না—নতুন কোচের নামও অবশ্য এখনো শোনা যায় নি। তিন ইরানী এ বছর বোধ হয় কলকাতায় আর খেলবেন না। মহামেডান দল থেকে অনেকেরই চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং তাদের দল যে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা শক্ত।

মোহনবাগানের বিশ্বজিৎ ইস্ট-বেঙ্গলে যাচ্ছেন জোর গুজব। মহামেডানের প্রতাপ ঘোষ আসছেন মোহনবাগানে। ইস্ট-বেঙ্গলের তরুণ দত্ত হয়তো জার্সি পাল্টাতে পারেন। তবে এসবই ময়দানী জল্পনা-কল্পনা। ১৫ই মার্চ না এলে স্পষ্ট করে বলা খুবই শক্ত।

কলকাতার ময়দানে এখন হকি লীগ চলছে। কিন্তু ময়দান জমে উঠছে না। তার কারণ পর পর বড় জাতের খেলা দেখে দর্শকরা ক্লান্ত। মামুলি খেলার প্রতি তাদের টান কমে যাচ্ছে।

ফেব্রুআরি ষোল সতেরো তারিখে কলকাতায় রাজস্থান ক্লাব ময়দানের দর্শকদের কয়েকটি আকর্ষণীয় আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতা উপহার দিল। ওই দুদিন কলকাতায় ডাবল উইকেট প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। পৃথিবী খ্যাত তারকাদের মধ্যে ছিলেন সার গারফিল্ড সোবার্স। তার সঙ্গে ছিলেন ওয়েস হল। এদের জুটিকে দেখবার জন্যই ইডেনে প্রচুর দর্শক হাজির হয়েছিল।

তরুণ দে হেড দিলেন হাঙ্গেরির লজোনেকাডিস্ ডান দিকে অরূপ দাস

সোবার্স এখন আর সেই সোবার্স নেই—সেই হলও কোথায় হারিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের নাম এখনো তেমনিই বেঁচে আছে।

এই প্রথম ইডেনের মাঠে কলকাতার দর্শকরা খেলতে দেখলেন ডেনিস লিলি ও জাহির আব্বাসকে। মূল পর্যায়ে দশটি দল ছিল। তাঁরা হলেন সোবার্স হল, লিন্সি ইয়ার্ডলি, জাহির ইমরান, সারনার হোল্ডিং, গাভাসকার শাস্ত্রী, অরুণলাল দোশী (এই জুটি প্রাথমিক পর্যায়ে জিতে মূল প্রতিযোগিতায় উঠেছিল), মিয়াঁদাদ সরফরাজ, মহিন্দার অমরনাথ পাতিল, দিলীপ মেণ্ডিস ডিমেল ও গ্যাব্রিয়েল বুচার।

এর মধ্যে সেমি ফাইনালে পৌঁছয় জাহির ইমরান, হোল্ডিং গারনার,

ভারতের বিদেশ বহু জার্সি বদল করলেন আর্জেন্টিনার ডোমিংগেজ-এর সঙ্গে

মেণ্ডিস ডিমেল ও গ্যাব্রিয়েল বুচার জুটি। ফাইনাল খেলা হয় দিলীপ মেণ্ডিস অশান্ত, ডিমেল ও হোল্ডিং গারনারের মধ্যে। সব দিক দিয়ে ভাল খেলে হোল্ডিং গারনার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। হোল্ডিং-এর চোখ ধাঁধাঁনো ছক্কা ইডেন বহু দিন মনে রাখবে। অষ্ট্রেলিয়ায় তিন দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত বেনসন ও হেজেস কাপ ক্রিকেট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র দুটি খেলাতে পরাজিত হয়ে বাকী সব কটি খেলা জিতে বিজয়ী হন। এই বিজয়ের জন্য দলনেতা লয়েড বিশেষ প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। তিনি আবার প্রমাণ করলেন একদিনের ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোনো জুড়ি নেই।

ইংলণ্ড সফর করছিল নিউজিল্যাণ্ড। সেখানে তিনটি টেস্ট-ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ড বহুদিন বাদে রাবার জয় করেছে ইংলণ্ডকে হারিয়ে। বহুদিন বাদে ইংলণ্ড

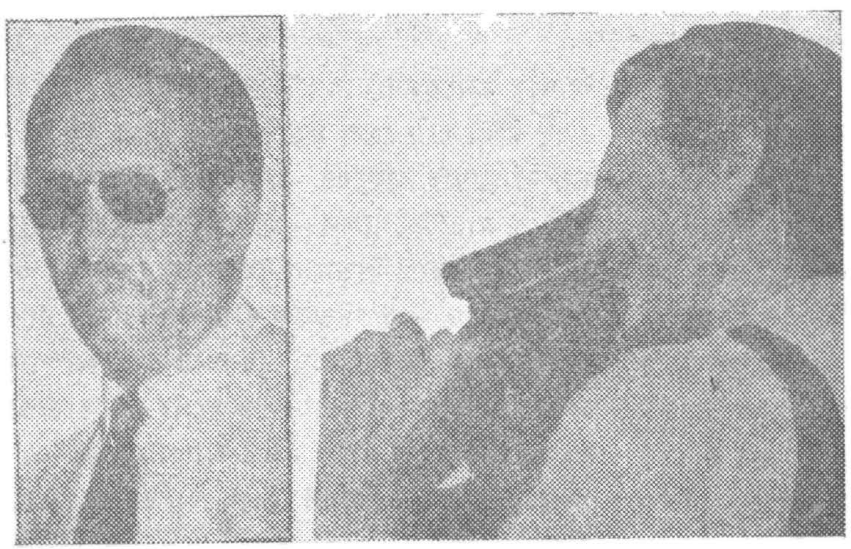

গ্যারি সোবার্স। ডেনিস লিলি ইডেনে ছবি মুভিতে ধরে নিচ্ছেন।

দল দু ইনিংসে ১০০-র চেয়েও কম রানে আউট হয়ে গেল। যা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকেছে ক্রিকেট বোদ্ধাদের কাছে। নিউজি-ল্যাণ্ডের কাছে হারের পর ইংলণ্ড দল যাচ্ছে পাকিস্তানে। সেখানেও তারা তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে। যদিও ইমরান খাঁ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারবে না তবু নিজের দেশে তারা নিশ্চয়ই শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াবে। এই সিরিজে পাকিস্তানের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন জাহির আব্বাস। কলকাতায় ডাবল উইকেট প্রতি-যোগিতায় জাভেদ মিয়াঁদাদ ডেভিস লিলির একটি লাফিয়ে ওঠা বলে মাথায় আঘাত পান। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন নি এই আঘাতের পর। তার জায়গায় ভারতের কিরমানি খেলেছেন। আশা করা যায় ইংলণ্ডের বিপক্ষে মিয়াঁদাদ খেলতে পারবেন। অষ্ট্রেলিয়া গেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। যদিও এই দলে লিলি মার্স বা চ্যাপেল নেই তবুও তারা সহজে ছাড়বে বলে মনে হয়।

মিনারচিক জালোচা বুনসল

(৩৯৭ পৃষ্ঠার পর)

করে। সারের বিরুদ্ধে খেলছিলেন প্রখ্যাত ব্যাটস-ম্যান ডেনিস কম্পটন। অসম্ভব ভালো খেলছিলেন, দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছিলেন। মারার বল মারছেন। দেখেশুনে একেবারে রাজকীয় ভঙ্গিতে। চারের পর চার। বাউণ্ডারির পর বাউণ্ডারি—মাঠে রানের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষ দল কম্পটনকে নিয়ে অস্থির হ'য়ে উঠছেন। কি করে ডেনিসকে আউট করা যায়—সবার মনে একটি চিন্তা। মাঠ ছড়িয়ে ফিল্ডাররা। সাধ্যমত চেষ্টা করছেন সবাই। কিন্তু কোন ফাঁকে বল চলে যাচ্ছে সীমানা টপকে। বড় অস্বস্তিকর অবস্থা। ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগে দাঁড়িয়ে আছেন এরিক বেডসার। সতর্ক উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেনটায়ার। নিস্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ। এরই মধ্যে ঘটে গেল মজার অথচ দুঃখজনক ঘটনা। অফ্ স্ট্যাম্পের বাইরের একটি বল পেয়ে ডেনিস সপাটে মারতে গেলেন—মারলেনও। বলটা ব্যাক-ওয়ার্ড শর্ট লেগে দাঁড়ানো বেডসারের পায়ের ওপর পড়ে চকিতে উইকেটরক্ষক ম্যাকেনটায়ারের গ্লাভসে বন্দী হল। আর যায় কোথায়। আম্পায়ার লক্ষ্য করছিলেন। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়ার্ডদের হাউজ ছ্যাট শব্দে ধীরে ধীরে আম্পায়ারের আঙ্গুল উপরে উঠল। ডেনিস দুঃখে অভিমানে প্যাভি-লিয়নের পথে পা বাড়ালেন। এই হল ক্রিকেট! বড় মজার—বড় দুঃখের। কখন কাউকে রাজা বানায়—কখন কাউকে ফকির।

রবীন্দ্রনাথ বসু

টিংকু ও পিংকু স্কুল ছুটির পর মাঠে খেলা দেখতে গেল। তাদের স্কুল থেকে একটু দূরে দুটো নামকরা দলের সঙ্গে খেলা হচ্ছে। সেদিন ছিল শনিবার। মাঠের চারধারে লোকের ভীড়। তারা দুজনে সমস্ত মাঠ চক্কর দিয়ে কোথাও একটু জুৎসই জায়গা পেল না যাতে ভাল করে খেলা দেখতে পায়। কি করবে ভাবছে এমন সময় টিংকু আঙুল দেখিয়ে পিংকুকে একটা বাড়ি দেখাল। বাড়িটা ভাঙাচোরা অনেক দিনের পুরোনো। সে বাড়িতে কেউ থাকে না। লোকেরা ভূতুড়ে বাড়ি বলে জানে।

পিংকু, চল ঐ বাড়ির ছাদে উঠে আরাম করে খেলা দেখি। কেউ আমাদের কিছু বলবে না, টিংকু বলল।

চল যাই। তারা দুজনে একটা জানলা গ'লে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠল। সেখানে একটা ছোট চিলেকোঠা ঘর। ভেতরে ঢুকে জানলা দিয়ে তারা খেলা দেখতে লাগল। সেখান থেকে বাড়ির পেছন দিকটা অনেকদূর অবধি দেখা যায়।

কি মজা বল, যেন একেবারে গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে বসে খেলা দেখছি! সকলে তো এটাকে ভূতুড়ে বাড়ি বলে জানে। কেউ এখানে ঝামেলা করতে আসবে না। টিংকু বলল।

খেলা ভেঙে গেছে। লোকেরা চলে গেছে। মাঠ ফাঁকা। পিংকু জানলা দিয়ে চারদিক দেখছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকার চারদিক ছেয়ে ফেলেছে।

এ-এই পিংকু, কে যেন নিচের ঘরে জানলা টপ্‌কে ঢুকছে! আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে টিংকু বলল।

দুজনে ভয়ে জড়সড় হয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। একজন গাট্টাগোট্টা লোক জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা খুলে দিল। পরমুহূর্তে দেখা গেল আর একজন লোক বাগানের চত্বর পেরিয়ে গুড়ি মেরে নিঃশব্দে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তারা ভাঙা কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আওয়াজ ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে।

হা ভগবান! পিংকু ওরা যে ওপর দিকে উঠছে! ফিসফিসিয়ে টিংকু বলল।

মুখে আঙুল দিয়ে পিংকু তাকে চুপ করে থাকতে বলল। পায়ের শব্দ হঠাৎ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেল। তারা ভাবল লোকদুটো বুঝি দোতলার ঘরে ঢুকেছে। জানলার নিচে তারা কান খাড়া করে চুপচাপ বসে রইল। টিংকু ভাবছে এরকম ভূতুড়ে বাড়িতে না ঢুকলেই ভাল হত। অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবার ছাদে ওঠার সিঁড়িতে কাঠের ওপর ক্যাঁচড় ক্যাঁচড় শব্দ হচ্ছে।

পিংকু টিংকুর কানে কানে বলল, ঐ ভাঙা আলমারীটা!

টিংকু হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারে আলমারীটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। পেছনে পিংকুও চলেছে। আলমারীর পাল্লা খোলা। ভেতরে কিছু নেই। খুব সন্তর্পণে তারা আলমারীর ভেতর ঢুকে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল। একটু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখল একটা পেনসিল টর্চের আলো ঘরের এদিকে ওদিকে পড়ছে।

সেই সময় সিঁড়ি থেকে একজনের চাপা গলা শোনা গেল। এই আবদুল! ওখানে কি করছ? কিছু দেখতে পেলে নাকি?

না হাসান। নিচের ঘরে একজোড়া নতুন বাচ্চাদের জুতো পড়ে আছে দেখলাম। যে এ বাড়িতে ঢুকেছিল সে চলে গেছে কিনা নিঃসন্দেহ হতে চাই। আলো নিবে গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শোনা গেল একজন বলছে, ঘরের মধ্যে বাচ্চা ছেলের জুতোটা আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছে।

অন্ধকারে আলমারীর মধ্যে টিংকুর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভয়ে আঁতকে তারা শুনতে পেল আগন্তুকদের একজন বলছে, আমরা এখান থেকে কোন কাজ করতে পারব না। যে এখানে ঢুকেছিল সে হয়ত আরো লোকজন নিয়ে আসতে পারে।

তাদের কথার আওয়াজ ও পায়ের শব্দ একই সঙ্গে মিলিয়ে গেল। টিংকুর হাত চেপে ধরে পিংকু আলমারী থেকে বেরিয়ে এল। মিনিট কয়েক তারা দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল। নিচে কারও ঘোরা ফেরার আওয়াজ হচ্ছে। তারপর সব চুপচাপ। দুজনে পা টিপে এগোতে লাগল।

আমার মনে হয় তারা চলে গেছে, আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছেড়ে পিংকু বলল। তবু আমরা কোন-রকম ঝুঁকি নেবনা। কোন শব্দ না করে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামব। হয়ত এখনও তারা নিচে কোথাও আছে!

একসঙ্গে পা ফেলে তারা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

পিংকু আমার হাঁচি পাচ্ছে, ফিসফিস করে টিংকু বলল।

খবরদার না! নাক টিপে ধরে থাক!

নিচের থেকে কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

টিংকুর হাতটা চেপে ধরে পিংকু দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল।

আমি কি একটু হাঁচতে পারি? টিংকু জিগ্যেস করল।

না, নাক টিপে থাক যতক্ষণ না আমরা জানতে পারি তারা চলে গেছে।

খুব সন্তর্পণে তারা সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে এল। চাপা গলায় পিংকু বলল, পেছন দিয়ে, যেদিক দিয়ে ঢুকেছি!

তারা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে হঠাৎ রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল একফালি আলো বাইরের বারান্দায় এসে পড়ল। দুজন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। থামের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখল এক জন লোক হাতে একটা ছোট বাক্স নিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজার দিকে পেছন করে ঘরের মধ্যে কাউকে কিছু বলছে। দুজন মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল, যেন সে ঘুরে তাদের না দেখতে পায়।

লোকটি বলছে, আবদুল তুমি কতক্ষণ এখানে থাকবে? তুমি কি এ পাড়া ছেড়ে চলে যাবে ঠিক করেছ?

না, আমি এ পাড়াতেই থাকব যতক্ষণ না আমাদের অপারেশন শেষ হয়। ঘরের ভেতর থেকে কঠিন রুক্ষ স্বর ভেসে এল। কিন্তু এখন থেকে আমরা আলাদা হয়ে যাব। সময় নষ্ট করোনা——চলে যাও! যে কোন মুহূর্তে মুন্না এখানে আসতে পারে। তাকে বারণ করে দিও—বলো এজায়গা নিরাপদ নয়। দশ মিনিটের মধ্যে আমি এখানকার সব চিহ্ন মুছে দিয়ে চলে যাব।

কিন্তু মুন্নারা তোমার সঙ্গে কিভাবে দেখা করবে জানতে চাইবে?

তাদের বলো ভৃগু সাংকেতিক শব্দে যোগাযোগ করতে। ব্যস, চলে যাও! আমি চাই না তার মত একজন অনুগত বন্দুকবাজ এখানে এসে গোলমাল বাধায়।

ঠিক আছে। তার সঙ্গে দেখা করে আমি তাকে ফিরিয়ে দেব। বাক্স নিয়ে লোকটি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মরচে পড়া দরজার ক্যাঁচর শব্দ তাদের দুজনকে জানিয়ে দিল অন্তত একজন চলে গেছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই পিংকুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। উঁকি মেরে দেখল আবদুল নামে লোকটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে হেড ফোন। সন্দেহজনক ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বেশ শক্ত সবল লম্বা চেহারা। আঁটসাঁট গেঞ্জী ও প্যান্ট পরে রয়েছে। ক্ষুদে ক্ষুদে জ্বলন্ত দুটো চোখ। কদম ছাঁট করে চুল কাটা। দেখলেই মনে হয় এক হিংস্র পাষণ্ড।

দমবন্ধ করে দুজনে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। যে ভয় তারা করেছিল তা থেকে রেহাই পেল। কোথাও সন্দেহজনক কিছু না দেখতে পেয়ে সে বাড়িতে একা আছে ভেবে লোকটি দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল।

পিংকুর জামার হাতাটা টেনে টিংকু বাইরে যাবার দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখাল। আর একটা হাতে তখনও সে নাক টিপে আছে।

পিংকু মাথা নেড়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলল। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে পিংকু দেখল দরজার কড়ায় তালাচাবি ঝুলছে। নিঃশব্দে তালাটায় চাবি দিয়ে চাবিটা পকেটে পুরে এগিয়ে গেল। বাইরের দরজা পার হয়ে বাড়ির পেছন দিকে সরু গলিতে এসে পড়ল। টিংকুর চোখ দিয়ে

জল পড়ছে। সে আর নাকটিপে থাকতে পারছে না। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রুমাল হাতড়াতে লাগল।

পিংকু চাপা গলায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এখন ওসবের সময় নয়! আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।

আমি আর পারছি না পিংকু....হ্যাঁ-আ-চ্ছ! হঠাৎ টিংকুর হাঁচিতে সেই অন্ধকার নির্জন সরু গলির মধ্যে বিকট আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। তারা দুজনেই চমকে উঠল।

টিংকুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পিংকু ময়লা ফেলার একটা ডাষ্টবিনের আড়ালে গিয়ে লুকোল।

আ-আমার আ-বার হাঁচি পাচ্ছে, পিংকু।

নাক চেপে ধর! মুখের মধ্যে রুমাল পুরে দাও। রাগে দাঁত চেপে ফিসফিস করে পিংকু বলল। এই মাত্র যে বেরোল সে নিশ্চয়ই আশে পাশে কোথাও আছে। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভীত কণ্ঠে বলল, হে ভগবান! কে যেন আসছে।

সেই সময় শুকনো রাস্তার ওপর বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। চাঁদের আলোয় একটা লোকের ছায়া রাস্তার ওপর পড়ল। ছেলে দুটো ভয়ে দম বন্ধ করে জড়াজড়ি করে বসে রইল। বেড়ালের মত নিঃশব্দে একজন লোক তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। চৌকো চোয়াল, লম্বা নাক, হাতে পিস্তল-এ নিশ্চয়ই বন্দুকবাজ মুন্না! পিংকু ভাবতে লাগল। সে লোকটার সঙ্গে নিশ্চয়ই এর দেখা হয়নি, একে ফিরিয়েও দিতে পারেনি। তার সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল।

লোকটি তাদের সামনে দিয়ে ভাঙা দরজা পার হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। দুজনে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দম ভরে নিঃশ্বাস নিল। তারপরেই লাগাল ছুট। চোখকান বুজে সোজা দৌড়ে একেবারে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে আবার ছুট। বেশ কিছুটা রাস্তা দৌড়ে যাবার পর তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

টিংকু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আজ বাড়িতে রক্ষে নেই। এতক্ষণ বাড়ির বাইরে, তার ওপর আমার নতুন জুতোটাও গেল।

আমরা এখনই বাড়ি ফিরছি না। চোখের ইসারায় বলল, টিংকু একজন পুলিস এদিকে আসছে!

তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে অন্যদিকে গেল। পুলিসটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখে বলল, এই বাচ্চারা, তোমরা এত রাতে এখানে কি করছ? চারদিকে গোলমাল, মারামারি হচ্ছে?

আমরা একটা বদমাস লোক ধরেছি! পিংকু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল।

হ্যাঁ সত্যিই তাই। শুধু তাই নয়, আমার জুতোটাও সে নিয়েছে! চিৎকার করে বলে উঠল টিংকু।

পা চেপে ধরে জুতো নিয়ে নিয়েছে এ্যাঁ! সাংঘাতিক ব্যাপার! ঘোরতর সমস্যা। পুলিসটা টিংকুর কাঁধ চাপড়ে বলল, যাও, এখন তোমরা সোজা বাড়ি চলে যাও, তোমাদের বাড়ির লোকেরা ভীষণ ভাবছে।

কিন্তু সত্যি বলছি, তারা বদমাশ চোর! পিংকু পকেট থেকে চাবি বার করে পুলিসকে দেখিয়ে বলল, এই দেখ! ওদের আমরা কাঁচাগলির পুরোনো ভাঙা বাড়িটার রান্নাঘরে চাবি দিয়ে এসেছি!

সেই ভাঙা বাড়িটা! ঐখানে তোমরা ছিলে? পুলিসের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাদের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে বলল, আমার সঙ্গে থানায় চল। তোমরা সেখানে কেন গেছলে জানি

না, তবে আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তোমরা দুজনে একটা বড় ডাকাত দলের সন্ধান পেয়েছ।

আমরা তাহলে মেডেল পাব, বল? বলতে বলতে টিংকু পুলিসটার পেছনে পেছনে যেতে লাগল।

মেডেল? হুঁ! তোমাদের কাজ দেখে না বড়বাবু আবার চটে ওঠে।

এদিকে স্কুলের ছুটির পর বাড়ির সবাই ভাবছে। টিংকুর মার ভীষণ ভাবনা হয়েছে। চারদিকে গোলমাল, মারামারি হচ্ছে। কোথায় ছেলেটা গেল! কিছু বলা নেই কওয়া নেই, রোজ বাড়ি ফেরে। আজ কি সে কোন গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল! তার দিদি রিংকু ভাবছে নিশ্চয়ই সে আর পিংকু কোন ঝামেলায় পড়েছে। তারা এমনিতেই যেখানে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ আছে সেখানেই ছুটে যায়। সেওতো কতবার তাদের সঙ্গে থেকে অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছে। একবার সে নিজে গিয়ে তাদের সন্ধান করবে কিনা ভাবছে।

এমন সময় পিংকুর মা তাদের বাড়িতে খবর নিতে এলেন। সঙ্গে লুসি কুকুরটাও এসেছে। এই সুযোগ! রিংকু বলল, মা, আমি কি তাদের খুঁজতে যাব?

মা বললেন, না তুই কোথায় যাবি? চারদিকে গোলমাল, কোথায় কি ঘটবে আবার একটা নতুন ফ্যাসাদ বাধুক আর কি!

ঠিক সেই সময় থানা থেকে খবর এল টিংকু পিংকু থানায় আছে। তাদের অভিভাবকরা যেন থানা থেকে তাদের নিয়ে আসে।

ওদিকে থানা থেকে সার্জেন্ট ফোন করে ইনস্পেক্টরকে জানাচ্ছে···আমরা ওদের বাড়িতে খবর দিয়েছি.... না সার, ছেলেগুলো এখানে আছে···হ্যাঁ সার, তাদের জিগ্যেস করে জেনেছি তারা স্পষ্ট দেখেছে.... ঠিক আছে সার। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সার্জেন্ট তাদের দিকে কটমটিয়ে চেয়ে দেখল।

একজন সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ জিগ্যেস করল, ডি. ডি. ইনসপেক্টর শীতল বাবু কথা বলছিলেন?

হ্যাঁ, এঘটনার জন্যে আমাকেই দোষ দিচ্ছেন। বলছেন ঐ বাড়িটার কাছাকাছি ছেলে দুটোকে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। গজগজ করতে করতে সার্জেন্ট বলল।

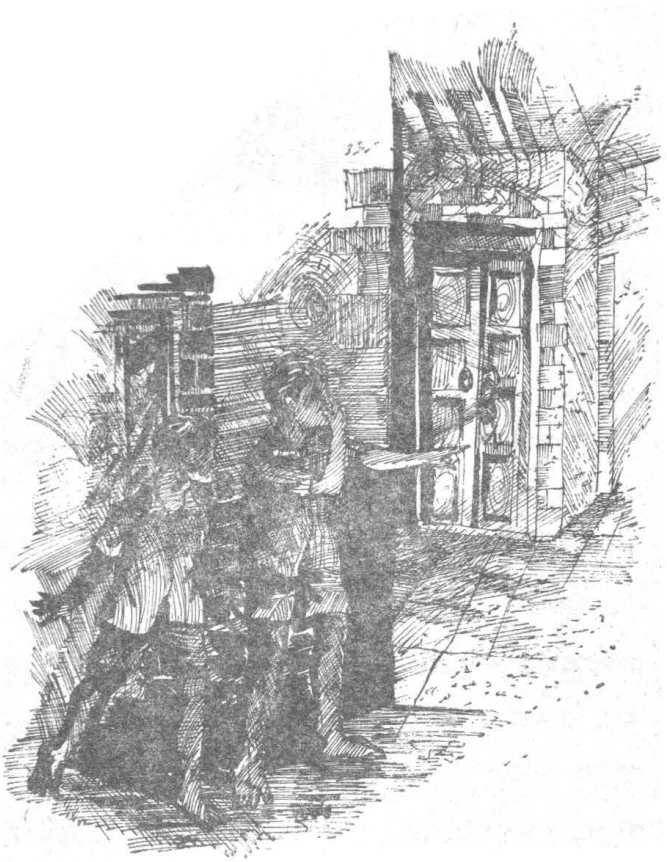

থানায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে টিংকু পিংকু ছটফট করছে। প্রায় আধণ্টা ধরে সার্জেন্ট তাদের নানা প্রশ্ন করছে। তাদের কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ইনসপেক্টর শীতলবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিল। কিছু সাদা পোশাক পরা পুলিসের তৎপরতা দেখা গেল। একজন সাদাপোশাকের ডিটেকটিভ এসে জানাল, নাঃ বড়বাবু আমাদের দুর্ভাগ্য। ঘরটা তালা দেওয়া

আছে ঠিকই। কিন্তু জানলা দিয়ে পাখি উড়ে গেছে। কোন চিহ্ন রেখে যায়নি।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বুঝতে পারছো এর মানে কি? সার্জেন্ট পিংকুর দিকে রেগেমেগে তাকাল। সব বদমাশগুলো ভেগেছে? হতাশায় বিড়বিড় করে পিংকু বলল। এর জন্যে তারা দুজনে দায়ী। সার্জেন্ট সে কথার কোন জবাব দিলনা। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আমার খিদে পেয়েছে,। অস্পষ্ট স্বরে টিংকু জানাল।

একজনকে উদ্দেশ করে সার্জেন্ট বলল, এই ছেলে দুটোকে ক্যানটিনে নিয়ে যাও। ওদের বাড়ির লোকেরা না আসা পর্যন্ত আটকে রেখে দেবে।

ঠিক তখনই একজন লোক ঘরে ঢুকে সার্জেন্টকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছি। আমার নাম শীতল সরকার। ছেলে দুটোকে নিয়ে গিয়ে একটু কথা বলতে চাই আপনার আপত্তি নেই তো?

ইন্সপেক্টর সরকার? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপত্তির কি আছে?

ইন্সপেক্টর সরকার তাদের দিকে বন্ধুভাবে তাকিয়ে মৃদু হাসল। সেই ভাঙাবাড়ি ছেড়ে আসবার পর থেকে তারা এমন ভাব কারও মুখে দেখেনি। আনন্দে লাফিয়ে উঠে ইনসপেক্টরের সঙ্গে ক্যানটিনে গেল। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের সামনে তারা তিনজনে বসল। টিংকু পিংকুর সামনে টেবিলের ওপর দুটো ডিশে খাবার সাজান আর দু কাপ গরম দুধ। তারা গোগ্রাসে সেগুলো খেতে লাগল। লোকটি বলল, আমি জানি সার্জেন্ট তোমাদের খুব জেরা করেছে। তোমাদের সবকথা আমার কাছে এখানে লেখা আছে। কিন্তু আমার মনে হয় অন্য দিক দিয়ে তোমরা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পার।

আমরা যা জানি সব বলেছি। পিংকু বেশ জোরের সঙ্গে বলল। সব গণ্ডগোলের জন্য আমি দুঃখিত।

না পিংকু, তুমি তোমার সাধ্যমত করেছ। তুমি ঠিকই ধরেছ ওরা বদমাশ, ডাকাত। এর বেশি তোমাদের কিছু বলতে পারব না। তবে আমি বিশ্বাস করি তোমরা এব্যাপারে আমাদের জন্যে কিছু করতে পারবে।

টিংকু ইনসপেক্টরের মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমরা আপনাদের সাহায্য করব। কিন্তু ঐ পুলিস সার্জেন্টটার জন্যে কিছু করব না—আমার কাছে মিনতি করলেও না। আমাদের জ্বালিয়েছে!

না না, তোমাদের ওপর জোর জবরদস্তি করেছে বলে পুলিসদের দোষ দিও না। ইন্সপেক্টর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, ঐ বাড়িটায় কি হচ্ছে আমরা জানি। সাদা পোশাকে পুলিস ঐ বাড়িটার ওপর নজর রেখেছে। ইউনিফর্ম পরা কোন পুলিশকে ওখানে পাহারায় না রাখবার জন্যে বলা হয়েছে। মতলব করা হয়েছে হঠাৎ হানা দিয়ে তাদের ধরা হবে।

এটা হবে আগামী সপ্তাহে।

আর আমরা এটা নষ্ট করে দিলাম! হায়রে! আমরা যদি সেখানে না যেতাম! তীব্র অনুশোচনায় পিংকুর মন ভরে উঠল।

কিন্তু তোমরা দুজনই তাদের খুব কাছ থেকে দেখেছ তাই না? যদি আবদুলকে আবার দেখ চিনতে পারবে?

পিংকু জোরে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

আর যে লোকটার হাতে পিস্তল ছিল? যাকে তোমরা মুন্না বলে শুনেছ?

সেই বিরাট বিশ্রী চেহারার বনমানুষটাকে যেখানেই দেখি না কেন ঠিক চিনতে পারব ! টিংকু উৎসাহিত হয়ে উঠল। উঃ কি ভীষণ ! ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকেও হার মানিয়ে দেয় !

একটা বিরাট চেহারার মানুষ, বড় বড় জ্বলন্ত চোখ, মাথায় জটার মত চুল—হ্যাঁ তোমাদের এরকম বর্ণনাই দেওয়া আছে। তোমরা একজন নতুন লোকের সন্ধান দিয়েছ, তার খোঁজ করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ আবদুলই তাদের নেতা। তাকে ধরবার জন্যে আমি তোমাদের সাহায্য চাই। ইনস্পেক্টর চেয়ারটা আরো কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, তোমাদের বাড়ির লোক এখানে আসছে। আমি তাদের রাজী করাব। তারা হয়ত এব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে। আমাদের লোক ছায়ার মত তোমাদের দুজনকে অনুসরণ করে চলবে....।

মানে আপনি বলতে চান আমাদের পেছনে লোক থাকবে। পিংকু দম ফেলে বলল।

যেখানেই তোমরা যাবে, মাথা নেড়ে জানাল ইন্‌সপেক্টর আমাদের লোক এমনই তৈরি কিছু বুঝতে পারবে না। আমরা জানি আবদুল এই অঞ্চলে কোথাও আছে। আমি তোমাদের কতক-গুলো জায়গা বলব, মনে হয় আবদুল সেখানের কোথাও থাকবে।

পিংকু জিগ্যেস করল, আর আমরা যদি তাকে দেখতে পাই ?

আমরা একটা বিশেষ সংকেত ব্যবহার করব। যে মুহূর্তে তোমরা আবদুল বা মুন্নাকে দেখতে পাবে সংকেত দেবে। আর সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। আমাদের লোকেরা তখন তাদের ঘিরে ফেলবার বন্দোবস্ত করবে। কি তোমরা রাজী ?

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে হাসি মুখে একসঙ্গে বলল, আমরা রাজী।

আর একটা কাজ আছে। সেটা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আমাদের লোক সাংকেতিক শব্দ বলে পরিচিত হবে। এখনই সেই সংকেতিক শব্দটা ঠিক করতে হবে। কাল আমিই তোমাদের অনুসরণ করব।

আমি মুখে পাখির ডাক ডাকতে পারি, এই রকম—এই বলে টিংকু মুখে আঙুল দিয়ে জোরে শব্দ করে উঠল।

হঠাৎ থতমত খেয়ে ক্যানটিনের একজন লোকের হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। এক পাশে দুজন পুলিস বসেছিল। তারা মুখ ঘুরিয়ে টিংকুকে দেখে বলল, আহা বেচারা। বোধ হয় পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে !

না টিংকু ও চলবে না, ইনসপেক্টর দৃঢ় কণ্ঠে বলল। এমন একটা কিছু চাই যা সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। ধর. পিংকু মাথার টুপীটা রাস্তায় ফেলে দেবে, সেইটা হবে সংকেত। আর একটা সাংকেতিক শব্দ চাই যা তোমরা ও আমাদের লোক ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। সে যদি তোমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত হয় ঐ সংকেতিক শব্দ দিয়েই পরস্পরকে চিনতে পারবে। কি সাংকেতিক শব্দ হবে ?

গোলাপ, আমি গোলাপফুল ভালবাসি, টিংকু বলল।

ঠিক আছে। উত্তর হবে বসোরা।

দরজা ঠেলে সেই সময় একজন পুলিস ঘরে ঢুকে জানাল, ছেলেদের বাড়ি থেকে লোক এসেছে। ইনসপেক্টর তাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এল। বলল, ওদের সঙ্গে কথা বলে আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেব।

বাড়িতে গিয়ে টিংকু তার দিদি রিংকুকে সব ঘটনা জানাল। রিংকু শুনে বলল, আমিও তোদের সঙ্গে

যাব আর লুসিকেও সঙ্গে নেব। যদি কোন গণ্ডগোলে পড়ি লুসি আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারবে। টিংকু জানাল, ইনসপেক্টরের কথা মত আমাদের কাল সকাল থেকে চীনা পাড়ায় টহল দিতে হবে।

এই নিয়ে তিনদিন তারা ডাকাতদের সন্ধানে ঘুরছে। পরের দিন যথারীতি সকালে জলখাবার খেয়ে রিংকু, টিংকু, পিংকু ও লুসি বেরিয়ে পড়ল। তাদের খুব আনন্দ, বেশ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। এই ধরনের কাজ করতে তারা খুব উৎসাহী।

সারাদিন ধরে বেশ কয়েকবার পাক দিল তারা চীনাপাড়ায়। শেষে টিংকু বিরক্ত হয়ে বলল, দশবার তো পাক খেলুম। এইভাবে ভবঘুরের মত আর কত ঘোরা যায়। আমি আর পারছিনা।

পিংকু বলল, চল টিংকু, ইনসপেক্টর অনেক আশা নিয়ে আমাদের ওপর ডাকত ধরার ভার দিয়েছে। তাকে কি হতাশ করা উচিত?

অগত্যা টিংকু তাদের সঙ্গে ঘুরতে লাগল। সেই মহল্লার দোকান, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, পোষ্ট-অফিস—সব জায়গায় তারা চুঁমেরে দেখল। কিন্তু তাদের সেই বদমাস লোকগুলোর কাউকে দেখতে পেল না।

একবারই তারা ইনসপেক্টর সরকারকে তাদের অনুসরণ করতে দেখেছিল। তাদের থেকে প্রায় কুড়ি গজ পেছনে ইনসপেক্টর একটা দোকানে কাগজ দেখছিল। এমন ভান করেছিল যেন তাদের চেনেই না

একটা লোহালক্কড়ের দোকান দেখে পিংকু বলল, এই দোকানটাতো আমাদের দেখা হয়নি?

সেটা অন্য কথা। কিন্তু কোন জিনিস না কিনে আমি আর ওজর দেখাতে পারব না। জুতোর দোকানে ঢুকে লজেন্স বিক্রি হয় কিনা জিগ্যেস করাতে লোকটা কেমন রেগে গেছল!

তোমার জন্যেই হয়েছিল—মুখে যা এল বোকার মত বলে ফেললে। এবার থেকে আমি কথা বলব, বুঝলে?

রিংকু লুসিকে নিয়ে তখন একটু দূরে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। পিংকু দোকানের সামনে এসে ঢুকতে যাবে এমন সময় টিংকু তার হাত ধরে টেনে বলল, ঐ দিকে দেখ পিংকু! বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা নিশ্চয়ই বন্দুকবাজ মুন্না!

তাদের দেখে মনে হল এই লোকটাকেই সেদিন গলির মধ্যে পিস্তল হাতে দেখেছিল। যদিও তাকে দেখতে খুব বিরাট নয়, মাথার চুলগুলো যদিও কদম ছাঁট দেওয়া নয়, তবুও তাদের মনে হল এই সেই লোক।

আমি সংকেত দিচ্ছি। উত্তেজনায় টিংকু মাথায় হাত দিয়েই বলল, এই যাঃ, আমার মাথায় তো টুপী নেই!

কিন্তু পিংকুর মাথায় টুপী ছিল। সেটা খুলে সে নামাতে গিয়ে হাত থেকে ফুটপাথের মাঝখানে ফেলে দিল। সেই সময় রাস্তায় সাইকেলে চেপে একজন লোক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, বাছা তোমার টুপীটা রাস্তায় পড়ে গেল।

তুমি কি গোলাপ ফুল? টিংকু উৎসাহের সঙ্গে জিগ্যেস করল।

ঠাট্টা করবার দরকার নেই। এই বলে সাইকেল আরোহী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল।

হা ভগবান! সেই গোরিলা মুন্নাটা এদিকেই আসছে! পিংকুর জামা টেনে ধরে টিংকু বলল। মনে হচ্ছে সে যেন কিছু সন্দেহ করছে। আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। এইবার আমাদের

চম্পট দেবার সময় হয়েছে !

পিংকু চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হতাশার সুরে বলল, কিন্তু কোথায় ইনসপেক্টর সরকার বা অন্য লোক ? কাউকে তো দেখছি না !

বন্দুকবাজ লোকটা তাদের দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

আমি চলি, এই বলে টিংকু সেখান থেকে দে ছুট।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পিংকু রাস্তার এদিক ওদিক দেখতে লাগল। সে নিশ্চয়ই জানে ইনসপেক্টর বা তার অন্য কোন লোক এখুনি এসে পড়বে। তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না।

প্রায় কুড়ি গজের মধ্যে সেই ভয়ানক দর্শন লোকটাকে দেখে পিংকুর মুখ শুকিয়ে উঠল। সে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে যেদিকে টিংকু গেছে সেদিকে দৌড় লাগাল। পথচারী লোকদের কাউকে পাশ কাটিয়ে, কাউকে ধাক্কা দিয়ে সে ছুটে চলল। ভাবল টিংকু নিশ্চয়ই গলি ঘুঁজি দিয়ে ওপাশের ফ্ল্যাট বাড়ির রাস্তায় পড়বে। ওদিকে টিংকুও পৌছে পিংকুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

পিংকু হাঁফাতে হাঁফাতে তার কাছে পৌছে বলল, পালাও ! সে আমাদের পেছনে আসছে ! ফ্ল্যাটবাড়ির পেছন দিকে চল।

ফ্ল্যাটবাড়ির পেছনে পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে পাশের ছোট গলিতে যাওয়া যায়। সেদিকে পরপর কয়েকটা গাড়ি রাখবার গ্যারেজ। সেগুলো বন্ধ। টিংকু একটা গ্যারেজের পাশ দিয়ে উঁকু মেরে দেখে বলল, গোরিলাটা আমাদের অনুসরণ করছে !

সে পালাবার রাস্তা খুঁজছে। তাড়াতাড়ি টিংকু ঐ সিঁড়িটা দিয়ে ওঠো। ছত্রিশ নম্বরে দেবু থাকে। ওর মা আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে। ওখান থেকেই পুলিসকে ওরা ডেকে পাঠাবে।

তারা পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দেবুরা তিনতলায় থাকে। তাদের ফ্ল্যাটের পেছন দিকের বারান্দায় উঠে কলিংবেল টিপল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই।

মরিয়া হয়ে পিংকু আবার বেল টিপল। টিংকু বারান্দায় ফুল গাছের টবের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে নিচের দিকে দেখল। ফিসফিস করে সে বলল, মনে হয় আমরা সেই গোরিলাটাকে ফাঁকি দিয়েছি। আবার গলা বাড়িয়ে আর একটু ভাল করে দেখতেই সে আঁতকে উঠল ! ওঃ ভগবান ! মোটেই সে বোকা বনেনি। ঠিক বারান্দার নিচেই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে !

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা বেঁচে গেছি টিংকু। দেবুর মার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কৃতজ্ঞচিত্তে টিংকু ঘুরে দাঁড়াল। তার হাতের কনুই লেগে একটা টব বারান্দার রেলিংয়ে হেলে পড়ল। ঠিক সেই সময় দেবুর মা দরজা খুলে দাঁড়াতেই নিচের থেকে একটা আওয়াজ ও আর্তনাদ এক সঙ্গে তারা শুনতে পেল। বারান্দায় ঝুঁকে দেখল নিচে পাথর বাঁধানো রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেই বন্দুকবাজ আর তার চারদিকে টবের ভাঙা টুকরো ও ফুল ছড়িয়ে রয়েছে।

কি মজা ! ওকে মেরে শুইয়ে দিয়েছি, আনন্দে হাততালি নিয়ে বলে উঠল পিংকু। হা ভগবান ! কি করেছ ! দেবুর মা সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে থতমত খেয়ে গেলেন।

ও একটা বদমাশ, ডাকাত ! পিংকু চেঁচিয়ে উঠল। ও উঠে পালিয়ে যাবার আগেই আমাদের পুলিস ডাকা উচিত।

চিৎকার আর হৈ হৈ শব্দে পাশাপাশি ফ্ল্যাটের

লোকেরাও বেরিয়ে এল। তারা জানতে চাইল ব্যাপার কি? ইতিমধ্যে দুজন লোক নিচে নেমে তার কাছে গেল।

টিংকু বারান্দায় লাফালাফি করছে আর চিৎকার করে বলছে। পুলিস! পুলিস! ওকে যেতে দিও না, ধরে রাখ—ও একটা বন্দুকবাজ, ডাকাত!

তখন একটা পুলিসের গাড়ি সেখানে এসে হাজির হল। গাড়ি থেকে দুজন পুলিস লাফিয়ে নামল।

ভগবানকে ধন্যবাদ! পিংকু বলল। ওরা ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের এবার নিচে যাওয়া ভাল, মাসিমা। ডাকাতকে ধরিয়ে দিয়েছি বলে পুলিস আমাদের ধন্যবাদ জানাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একজন পুলিস তাদের ধরে বলল, তোমাদের দুজনকে থানায় নিয়ে যাই চল।

ঠিক আছে, চল। পিংকু ভাবল এরা আসল ব্যাপার কিছু জানে না। সেখানে গেলে সব পালটে যাবে। এখন থেকে পুলিস আমাদের দুজনের ওপর খুব সন্তুষ্ট হবে।

থানায় গিয়ে তাদের চক্ষু চড়কগাছ! ঢুকেই প্রথমে দেখা হল ইনসপেক্টর সরকারের সঙ্গে। তার মুখে সন্তুষ্টির কোন ভাবই নেই। সে জিগ্যেস করল, যে লোকটাকে ফুলের টব দিয়ে তোমরা মেরেছ, তাকে কে বলে তোমরা মনে কর?

পিংকু বেশ জোর দিয়ে বলল, কেন, মুন্না নামে বন্দুকবাজ ডাকাত? ইনসপেক্টরের চোখের চাহনি দেখে পিংকুর কেমন যেন সন্দেহ হল।

কিন্তু তোমরা বলেছিলে মুন্না জটাধারী, বিশ্রী বিরাট বনমানুষের মত চেহারা, যাকে মেরেছ তার সঙ্গে কোন মিল আছে?

সেদিন রাতে গলিতে যাকে দেখেছিলাম সে বলেই মনে হয়। পিংকু সহসা অস্বস্তি বোধ করতে করতে লাগল। হ্যাঁ, ওই সেই লোক। ওকেই আমরা সেই ভাঙা বাড়িটার বাইরে দেখেছিলাম, তাই না টিংকু?

হ্যাঁ, ঠিক সেই। টিংকু জোরে মাথা নেড়ে সায় দিল।

ইনসপেক্টর সরকার গালে হাত দিয়ে একটু ভেবে সার্জেন্টকে বলল, আমারই ভুল। মুন্না বলে যে লোকটার তারা বর্ণনা দিয়েছিল, যাকে তারা সেই গলিতে দেখেছিল, সে যে আমাদের রাম সিং হতে পারে আমি একবারও তা ভাবিনি।

আপনি তাহলে বলতে চান আমরা গলিতে যে লোকটাকে দেখেছি সে ডাকাত নয়?

সঙ্গে সঙ্গে টিংকু বলে উঠল, যদি সে বদমাশই না হবে তবে কেন সে আমাদের পেছনে তাড়া করেছিল?

কারণ সে আমাদেরই লোক। সে রাতে সে ঐ ভাঙা বাড়িটার ওপর নজর রেখেছিল তাকেই তোমরা দেখেছিলে। আজও সে তোমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছিল।

হায়! হায়! এ কি করেছি! কণ্ঠে ঢোঁক গিলে পিংকু বলল। তাই যখন আমরা টুপীটা ফেলেছিলাম সে আমাদের পিছু পিছু এসেছিল!

একটু সামান্য ক্ষত হয়েছে, আর বিশেষ কিছু নয়! দরজার কাছে গলায় আওয়াজ পাওয়া গেল। রাম সিং ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার কপালের ওপর একটা প্লাষ্টার লাগান। বলল, বন মানুষ ভেবে ভুল করে ফুলের তোড়া দিয়ে শুইয়ে দিলে!

রামসিংয়ের কথায় ও চোখের ভাবে কৌতুকবোধ করে ছেলে দুজন একটু আশ্বস্ত হল। তাদের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে রাম সিংকে

সেদিন চাঁদের আলোয় দেখে কি করে তারা তাকে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত বলে মনে হয়েছিল।

যাক, সব ঠিক আছে জেনে খুশী হলাম। পিংকু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আমরা আমাদের কাজে যাই, ইনসপেকটর। চীনা পাড়াটার খোঁজা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। ওপাশের মেলার দিকটাই যা এখন আমাদের সন্ধান করবার আছে।

টিংকু বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমরা সারাদিন মেলায় কাটাব। পরিশ্রম করতে আমরা ভয় পাই না।

সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট বলল, তোমরা সোজা বাড়ি চলে যাও! রাম সিংয়ের ব্যাপারে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে। তোমাদের দুজনের মত ভয়াবহ বস্তুকে এ ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কিন্তু ওরা তা করতে পারেনা আমরা এই সামান্য একটা ভুল করেছি বইতো নয়! পিংকু ইনস-পেকটরের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল।

আমি দুঃখিত। ইনসপেকটরের গলায় সহানুভূতি। এটা ঠিক। উপরওয়ালার হুকুম তোমাদের দুজনকে এ কাজ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ওঁরা আর তোমাদের সাহায্য চান না!

টিংকু পিংকু বুঝতে পারল কোন কথায় আর কাজ হবে না। বিষণ্ণ মনে বিদায় জানিয়ে তারা থানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে রিংকু লুসিকে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের মুখ দেখে বুঝতে পারল কিছুতে তারা নিরাশ হয়েছে। জিগ্যেস করে জানতে পারল যে তাদের আর ডাকাত ধরার কাজে দরকার লাগবে না।

বাড়ি ফিরে এসে তারা মতলব করতে লাগল কি করা যায়। ঘরের মধ্যে তারা বসে আছে। হঠাৎ লুসি ঘেউ ঘেউ করে ডেকে জানলার দিকে ছুটে গেল। তিনজনে এক সঙ্গে মুখ তুলে সেদিকে তাকাল। তাদের মনে হল কে যেন জানলার পাশ থেকে চট করে সরে গেল! তারা দৌড়ে বাইরে এল কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কাউকে দেখতে পেল না।

তাদের ভীষণ ভাবনা হল। কে চুপি চুপি এখানে এসেছিল? আর কেনই বা এসেছিল? কি তার উদ্দেশ্য হতে পারে?

টিংকু বলল, আমার মনে হচ্ছে সেই ডাকাতদের কেউ এখানে এসেছিল।

রিংকু জিগ্যেস করল, কেন? এখানে আসবে কেন? টিংকু জানাল, তারা ইনসপেকটর সরকারের কাছ থেকে শুনেছে একমাত্র তারা দুজনেই সেই ডাকাতদের বিশেষ করে তাদের দলপতি আবদুলকে চাক্ষুষ দেখেছে। তাই ইনসপেকটর আমাদের লাগিয়ে তাদের ধরতে চেয়েছিল।

ঠিক কথা! পিংকু বলে উঠল। আমরা নিজেরাই এবার মাঠে নামব। কালই আমরা যাব মেলায় তাদের খোঁজে।

সেই কথাই ঠিক হল। টিংকু পিংকু একদিকে তাদের সন্ধানে থাকবে আর রিংকু লুসিকে নিয়ে অন্য দিকে লক্ষ্য রাখবে। এ যেন তাদের সাঁড়াশী অভিযান!

মিনি রেলের জায়গাটা আর একবার ঘুরে দেখি। টিংকু বলল। আমার মনে হচ্ছে আবদুল এখানেই আসতে পারে।

না। আমার কাছে পয়সা আর নেই। সারাদিন ধরে অনেক খরচ করতে হয়েছে। আমরা কি এখানে মজা করতে এসেছি! পিংকু সেদিকে

না গিয়ে, দোলনা ঘুর্নি সব এড়িয়ে পাশে সাজান দোকানের দিকে এগোতে লাগল। ভাবল, এগুলো একবারও ঘুরে দেখা হয়নি।

বেশ কয়েকঘণ্টা ঘুরে ঘুরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা দোকানের কাছে তারা দুজন বসে পড়ল। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ টিংকু স্থির দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে। সরবতের দোকান ও বইয়ের স্টলের মাঝখানে ভাগ্য পরীক্ষা করার একটা স্টলের দিকে তার চোখ রয়েছে। হঠাৎ টিংকু ভয়ে ভয়ে সাইন বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বলল, পিংকু ওই নাম—স্টলের নামটা লক্ষ্য কর!

সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—

কেবলমাত্র আজকের জন্যে
প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ভৃগু
আপনার ভবিষ্যৎ বলবেন
- মাত্র একটাকায় আপনার ভবিষ্যৎ জানুন!

অনেকক্ষণ ধরে তারা সেই বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আচ্ছা এই ভৃগু সম্বন্ধে আবদুল কি যেন বলেছিল? পিংকু জিগ্যেস করল। আমি জানিনা, তুমিই তো শুনেছিলে!

হ্যাঁ। ভৃগু কথাটার মধ্যে একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। মনে পড়েছে! আবদুল বলেছিল তার দলের লোককে ভৃগুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে!

ঠিক হয়েছে! টিংকু উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠল এর মানে কি আমরা ধরতে পারলুম—সত্যি কথা বলতে কি আমি অনুমান করতে পেরেছিলুম প্রায় সবটাই!

চলে এস, আমাদের ইনসপেকটর আর পুলিসদের খুঁজে বার করতে হবে।

তারা দুজনে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসছে।

পুলিসের হুকুম অনুযায়ী রাতে মেলা বন্ধ থাকবে। তাই লোকের ভীড়ও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। তাদের দুজনকে হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে দেখে রিংকু ছুটে এসে জিগ্যেস করল, ব্যাপার কি? তোমরা ডাকাতদের দেখতে পেয়েছ?

হ্যাঁ, তাই অনুমান করছি। টিংকু বলল।

ইনসপেকটরকে খুঁজছি। আমরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠব না। পিংকু জবাব দিল।

রিংকু বলল, দিদি ওই প্যাণ্ডেলটার ওপর নজর রাখ। কেউ বেরোলেই আমাদের খবর দেবে।

পিংকু একটু এগিয়ে গিয়েই বলে উঠল, ওই যে একটা পুলিস! তার কাছে যেতেই তাদের দেখে সে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাগে কটমট করে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আবার তোমরা!

তুমি বুঝতে পারছ না, চেঁচিয়ে বলে পিংকু, আমরা ভৃগুকে খুঁজে পেয়েছি—সে জ্যোতিষী।

তোমরা অনেক গোলমাল বাঁধিয়েছ! পুলিসটা ভুরু কুঁচকে তাদের দেখল। এর মধ্যে জ্যোতিষীর কি করবার আছে আমি বুঝতে পারছিনা। তবে সার্জেন্ট যে তোমাদের এ ব্যাপারে নাক গলাতে বারণ করে দিয়েছে সেটা আমি ভালই জানি। যাও, পালাও এখান থেকে!

কিন্তু মেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভৃগু যে পালিয়ে যাবে। পিংকু বলল।

আমি বলছি যাও! দুজনেই পালাও! ওই বলে পুলিসটা এমনভাবে তাদের দাঁত খিচিয়ে উঠল মনে হল যেন তার হাতের ব্যাটন এখুনি চালাবে। তারপরেই সে ভারিক্কি চালে পা ফেলতে ফেলতে

অন্যদিকে চলে গেল।

হা ভগবান! পিংকু এখন আমরা কি করব? থানায় গিয়ে ইনসপেকটরকে বললে সে কি শুনবে?

আমাদের তারা ঢুকতেই দেবে না! তাছাড়া লোকেরাও মেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভৃগুও মালপত্তর গুটিয়ে সরে পড়বে। কাল হয়ত নাও আসতে পারে!

তারা গুটি গুটি পায়ে স্টলের দিকে এগোতে লাগল। সামনে একজন লোক টিকিট ঘরের কাঠের প্যাণ্ডেলটা খুলে ফেলছে।

যদি ইনসপেকটর এখানে থাকত, আফশোষ করে বলল পিংকু।

রিংকু তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে বলল, আচ্ছা এমন কিছু একটা করলে হয় না যাতে পুলিসের নজর এদিকে পড়ে?

দি আইডিয়া! ভাল মতলব, কিন্তু···। ভুরু কুঁচকে পিংকু এদিক ওদিক তাকিয়েই আনন্দে বলে উঠল, পেয়েছি! তারপর টিংকুর হাত ধরে টেনে বলল, ঐ যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে মোটা দড়ি গোটানো। দড়িটার একটা মুখ গাড়িতে বেঁধে আর একটা মুখ স্টলের কোন বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দেব। গাড়িটা নিশ্চয়ই মালপত্তর নিয়ে ওখান থেকে চলে যাবে।

ও বুঝেছি! সেই সঙ্গে সমস্ত স্টলটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। মুখে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে টিংকু বলল। দারুণ মতলব! কিন্তু তোমাকে ঐ দড়ি বাঁধার কাজটা করতে হবে। বাঁশে দড়ি বাঁধতে গিয়ে যদি আমাকে ঐ ভৃগু বদমাশ জ্যোতিষী ধরে ফেলে!

ঠিক আছে, আমি ও কাজ করব। তুমি গিয়ে গাড়িতে দড়ি বেঁধে দড়িটা এদিকে নিয়ে এস। রিংকুর দিকে ফিরে বলল, আর তুমি চেঁচিয়ে পুলিস ডাকবে। যদি দেখ কেউ পালিয়ে যাচ্ছে লুসিকে তার পেছনে লেলিয়ে দেবে।

অন্ধকার তখন প্রায় নেমে এসেছে। তারই মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে পিংকু বাঁশের খুঁটিতে দড়ির গিঁট লাগিয়েছে ঠিক তখনই সামনের সেই রোগা লোকটার চাপা গর্জনে টিংকুর দেহের রক্ত হিম হয়ে এল।

কি হচ্ছে খোকা? স্টলের পেছনে কি বদ মতলবে ও রকম ভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছ? চল, দেখি ভৃগু কি বলে শুনি। এই বলে লোকটা পিংকুকে ঐ অবস্থায় সামনে দরজার কাছে নিয়ে এল।

টিংকুর ভীতি বিহ্বল অবস্থা কেটে যেতেই প্রাণপণে দৌড়তে লাগল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছ পিংকুকে ওরা ধরেছে!

একজন বুড়ো লোককে ধাক্কা দিতেই সে ঘুরে গেল। রেগে গিয়ে বলল, শয়তানের বাচ্চা!

টিংকু দূরে পুলিসের পোশাকে একজনকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে বলতে লাগল, ডাকাত! ভৃগুর দল পিংকুকে ধরেছে!

পুলিসটা তার ভারিক্কি চালে টহল দেওয়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। টিংকু তার কাছে যেতেই রুক্ষস্বরে বলল, আমি দ্বিতীয়বার আর বলব না, চলে যাও শিগগির!

টিংকু মিনতি করে বলল, এখুনি ওদিকে যেতেই হবে।

আমার রাগ বাড়িও না, চলে যাও! এতটুকু বাচ্চা, ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ!

টিংকু চারদিকে একবার দেখল। মরিয়া হয়ে

ভাবছে কি করবে। হঠাৎ একটা বদবুদ্ধি তার মাথায় এল। সে নিচু হয়ে এক মুঠো কাদা তুলে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে পুলিসটার দিকে ছুড়ে দিল। কিন্তু সেটা পুলিসের গায়ে না লেগে একজন ধোপ দুরস্ত কাপড় পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকের গায়ে পড়ল।

এ্যাঁ, কাদা! থু থু শব্দ করে রেগে উঠে বলল, ঐ ছোঁড়াটা ছুঁড়েছে!

আমি দুঃখিত, এই বলে টিংকু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ভদ্রলোকটি হঠাৎ চিৎকার করে তাকে ধরবার জন্যে লাফিয়ে উঠল।

টিংকু পাশ কাটিয়ে পালাতে গেল। সেই সময় পুলিসটাও সেদিকে ফিরে তাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে এল। এদিক ওদিক করে দুজনকে পাশ কাটিয়ে টিংকু দৌড়তে লাগল। সে তখন ভাবছে দুই হিংস্র শিকারী কুকুরের মুখ থেকে আমার মত এক খরগোসের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

হঠাৎ সে দেখল ইনসপেকটর সরকার রাস্তার ধারে দাঁড়ান একটা গাড়ির দরজা খুলছে। সে কোন রকমে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ইনসপেকটর সাহায্য করুন। কিন্তু তার কথা ভীড়ের গণ্ডগোলের মধ্যে মিশে গেল। ততক্ষণে গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় পুলিসের একটা হাত তার কাঁধের ওপর পড়ল। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেলার মধ্যে হৈ-হট্টগোলের আওয়াজ উঠল। গাড়িটা চলতে শুরু করতেই দড়িতে টান পড়ে স্টলটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল আর গাড়ির টানে সেটা এগোতে লাগল। তেরপল, দড়ি, বাঁশ, কাঠ, লোক সব একসঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল। সে লোকটা পিংকুকে তখনও ধরে রয়েছে। পিংকু দেখল ভৃগু নামে আবদুল ডাকাতটার গায়ে চকমকে জরির সাজ, মাথায় পাগড়ী বাঁধা। চারিদিকে তাস ছড়ানো, ম্যাজিকের দড়ি, কাঁচের বল—তার মধ্যে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আবদুল। পিংকু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল আর চিৎকার করে বলতে লাগল—বাঁচাও এখানে আবদুল ডাকাত!

কিন্তু গণ্ডগোলের মধ্যে তার গলার স্বরও কিছুই শোনা গেল না। ভৃগু ব্যাপার বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে স্টলের পেছন দিকে দৌড় দিল। আর গায়ের পোশাক খুলে ফেলতে লাগল।

একটা গাড়ি এসে তার পথ আগলে দিল। গাড়ির ভেতর থেকে একজন লাফিয়ে নেমে পড়ল।

ক্ষীণ স্বরে পিংকু বলে উঠল, এ যে ইনসপেকটর সরকার!

আবদুল বিপদ এড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু শেষে তাকে ধরা পড়তে হল। ইনসপেকটরের চিৎকারে পুলিস পিংকুকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই ছুঁচো মুখো লোকটাকেও ধরল।

ইনসপেকটর সরকার পিংকু টিংকুর কাছে এসে বলল, তোমাদের ধন্যবাদ! তোমাদের জন্যেই ভৃগুর ছদ্মবেশে আবদুলকে ধরতে পারলাম। গতকাল আমরা এখানে সন্ধান করে গেছি কিন্তু তার কোন হদিশ পাইনি। আজও আমরা এ জায়গা ঘিরে রেখেছিলাম কিন্তু তোমরা ভৃগুকে না দেখতে পেলে আজও সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেত। তোমাদের এমন বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ দেখে আমি অবাক হয়েছি।

হঠাৎ সেই সময় লুসির ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শোনা গেল। পিংকু বলল, শিগগির চলুন, ইনসপেকটর, রিংকুর নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে। পিংকু দৌড়তে লাগল। টিংকু ও তার পেছনে দৌড়ল।

ইনসপেকটর কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তারপর সঙ্গের লোকজনদের নিয়ে অনুসরণ করতে বলল।

কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল লুসি ঘেউ ঘেউ করতে করতে একজন লোকের পেছনে দৌড়চ্ছে। ইনসপেকটর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে ধাওয়া করল। লোকটা দৌড়চ্ছে, একবার করে পেছন ফিরে পিস্তল ছুঁড়ছে। ইনসপেকটরও গাড়ি থেকে গুলি করছে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলবার পর হঠাৎ

লোকটা কিসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পিস্তলটাও হাত থেকে ছিটকে পড়ল। লুসি ছুটে গিয়ে তার বুকের ওপর দুটো পা দিয়ে যেন বিজয়ীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটাকে দেখেই টিংকু চিনতে পেরেছিল। এই সেই ভয়ঙ্কর, বিশ্রী বনমানুষ—মুন্না।

অবশেষে তাদের নিয়ে ইনসপেকটর সরকার থানায় চলল। কিন্তু টিংকু থানায় যেতে রাজী নয়। সে বলে, ঐ সার্জেন্টটা আমাদের পছন্দ করে না।

ইনসপেকটর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আজ তোমরা যে কাজ করলে, সারাজীবন সে তোমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে।

থানায় ঢুকতেই সার্জেন্ট তাদের আদর করে ভেতরে নিয়ে গেল। চেয়ারে বসিয়ে তাদের জন্যে ক্যানটিন থেকে গরম দুধ আর ভাল খাবার আনতে হুকুম দিল।

তারপর একগাল হেসে বলল, আমি তোমাদের ভুল বুঝেছিলাম। তোমরা আজ একটা বিরাট কাজ করলে। এ খবর কাগজে বেরোলে চারদিক থেকে তোমাদের প্রশংসা আসবে। তোমাদের বাড়ির লোকেরা এখুনি এসে পড়বেন। তাঁরাও খুব খুশী হবেন।

তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না—এই কি সেই খিটখিটে বদমেজাজী সার্জেন্ট!

সবশেষে ইনসপেকটর সরকার জানাল. ওপর ওয়ালার তোমাদের কাজে খুশী হয়ে তোমাদের বিশিষ্ট সেবা পদক পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

হেঁয়ালি

রাজপুত্র

শিক্ষক: আচ্ছা বলতো দীপু, রামসিং একজন চোর কোন টেন্স?

দীপু: প্রেজেন্ট টেন্স স্যার।

শিক্ষক: এবার ওটাকে পাস্ট টেন্স করলে কি হবে বলতো?

দীপু: পাস্টটেন্স করলে হবে স্যার। রামসিং জেলে যাবে।

পথচারী: কি দাদা, রেললাইনের ধারে বসে আছেন কেন?

আর ঝোলা সঙ্গে কেন?

ভদ্রলোক : রেলে মাথা দিয়ে মরব বলে। আর ঝোলাতে গুড় আর রুটি।

পথচারী : মরবেন যখন, গুড় আর রুটি আনার প্রয়োজন কি ?

ভদ্রলোক : যদি রেল আসতে দেরী হয় তাহলে খিঁদে পাবে না।

শিক্ষক : আচ্ছা বলতো দীপু, ইংরেজিতে লাইট পোস্ট বানান কি ?

দীপু : LIGHT POOST লাইট পোস্ট ঠিক বলিনি সার ?

শিক্ষক : একটু ভুল আছে, পোস্ট বানানে দুটো 'ও' লাগালি কেন ?

দীপু : পোস্টটা বেশ শক্ত হবে স্যার।

কবির কৌতুক

পথিক মণ্ডল

বহুকাল আগের কথা। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে 'বিচিত্রা' নামে এক সাহিত্য সভা বসতো। এই সভায় অনেক জ্ঞানীগুণী লোক ও সাহিত্য পিপাসু ব্যক্তিরা জড়ো হতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই সভা থেকেই হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ই পরিচয় করিয়ে দেন।

এই সাহিত্য সভার সময় বাইরে জুতো খুলে রেখে ঘরে গিয়ে বসতেন সাহিত্য পিপাসুরা। কিন্তু প্রায়ই দেখা যেতো সভা শেষে কারুর না কারুর জুতো চুরি গেছে।

একদিন এই 'বিচিত্রা' সাহিত্য সভায় যোগ দিতে এসে শরৎচন্দ্র জুতো চুরির খবর জানতে পারলেন। কেউ কি আর জেনে শুনে বিষ পান করতে চায় ? তাই তিনি তাঁর নতুন জুতো জোড়া হাতের খবরের কাগজে মুড়ে হাতে নিয়ে বসলেন কবির খুব কাছে। শরৎচন্দ্রের এ ব্যাপার আগেই লক্ষ্য করেছিলেন কবি সত্যেন দত্ত। শরৎচন্দ্র ঘরে ঢুকবার আগেই সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে এই কথাটি বলে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথের কাছেই বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরৎ, তোমার হাতের মোড়কে কি ?" শরৎচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আছে একটা জিনিস।' কবি এবার কৌতুক করে বললেন, পাদুকা-পুরাণ নাকি ?' শুনে সব্বাই হাসতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র একাকী লজ্জায় চুপসে গেলেন।

কোন জিনিস একটা দিতে নেই, শুনেছি কালীঘাটের কুকুর হয়। তাই আরো একটা কৌতুক শোনাচ্ছি—।

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব এক সন্ধ্যা বেলায় মেয়েদের গান শেখাচ্ছিলেন। গানটা এই রকম—হে মাধবী, দ্বিধা কেন ?'.....

হঠাৎ এই সময় কবির ভৃত্য বনমালী কবির জন্য একটি প্লেটে আইসক্রীম নিয়ে এসে হাজির হ'ল দরজার কাছে। সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো ঢুকবে কি ঢুকবে না। ভেতরে একটু পা বাড়ায় আবার ফিরে আসে। হঠাৎ কবির এ' ব্যাপারের উপর নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব বনমালীকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠলেন, 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন ? ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন ? আসবে কি ফিরিবে কি—দ্বিধা কেন ?'

বনমালী ততক্ষণে ছুটে পালিয়েছে। এই কাণ্ড দেখে সকলেই প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে উঠলো।

তোমরা কবির এই দু'টি কৌতুকের খবর পেয়ে কতটা আনন্দ পেলে জানিও। আরো মজার মজার ঠিক এমনই সব গল্প তোমাদের এক সময় শোনাবো।

হাস্যকৌতুক পাটুলীপুত্র

(১) জানালার ঠিক পাশেই টি. ভি. টা রয়েছে। দাদু তার দুই নাতনী সোনা ও মানাকে নিয়ে সিনেমা দেখছেন। হঠাৎ সিনেমার এক দৃশ্যে ভীষণ আগুন লাগল। অবাক বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে দাদুর হঠাৎ খেয়াল হল। তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ও সোনা, ও মানা তোরা যে চুপ করে বসে আছিস, দেখছিস না কিরকম আগুন লেগেছে। জানলার পর্দাটা তুলে দে। অত সুন্দর ছাপা পর্দাটা যে পুড়ে যাবে।

(২) খুট করে আওয়াজ হতেই গৃহকর্তার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে দেখেন একটা লোক আলমারি খুলে টর্চ জ্বেলে কি যেন করছে। তিনি উঠে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে চোর চোর বলে চেঁচাতে লাগলেন। তখন লোকটি বলে উঠল—আপনি ভুল করছেন। আমি চোর নই। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা চোর এসেছিল বটে, তবে আমাকে দেখতে পেয়ে আলমারি খোলা রেখেই পালিয়েছে। তাই পরীক্ষা করে দেখছিলাম জিনিসপত্র সব ঠিক ঠাক আছে কিনা।

(৩) অজয় আর বিজয় দুই বন্ধু। অনেকদিন দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ একদিন রাস্তায় দুজনের দেখা। অজয়—কিরে বিজয় এতদিন কোথায় ছিলি?

বিজয়—আমি এতদিন বিদেশে ছিলাম। কয়েকদিনের জন্য এসেছি। আবার চলে যাব। তুই কোথায় আছিস? অজয়—আমি এ দেশেই আছি। তাহলে তুই আর আমি বরাবর পাশাপাশিই রইলাম।

বিজয়—কি রকম?

অজয়—পড়াশুনাতে আমি হতাম প্রথম তুই দ্বিতীয়। খেলাধূলাতেও তাই, তাছাড়া উঠতে বসতে বেড়াতে আমরা সব সময় পাশাপাশি থাকতাম। এখনও দেখ, আমি A-দেশে, তুই B-দেশে।

(৪) শিক্ষক—কুমীর কোথায় বাস করে?

ছাত্র—জলেও বাস করে স্থলেও বাস করে।

শিক্ষক—বেঞ্চির ওপর দাঁড়াও (রেগে গিয়ে)।

ছাত্র—কেন সার, পাড়ার বন্ধুরা তো আমার কাছে সিনেমা দেখার জন্য টাকা চায়, না দিলে বলে তোর আবার চিন্তা! তোর বাবা তো টাকার কুমীর।

ধাঁধা

গৌতম ঘোষ

(১) নীচে 'ক' শ্রেণীতে বিখ্যাত মনীষিদের নাম রয়েছে এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণীতে তাঁদের জন্মস্থান ও জন্মসালগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। মনীষিদের নামের পাশে যথাক্রমে তাঁদের জন্মস্থান ও জন্ম সালগুলো সঠিক ভাবে বসাতে পারবে? দেখই না চেষ্টা করে।

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন,

বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, উদয়শঙ্কর, পি. সি সরকার।

(খ) বাড়ুলি, বীরসিংহ, চরুলিয়া, কাঁঠালপাড়া, কটক, সাগরদাঁড়ি, উদয়পুর, ময়মনসিংহ, সিমলা, রাধানগর।

(গ) ১৯০০, ১৮৯৯, ১৮৯৭, ১৮২০, ১৮২৪, ১৯১৩, ১৮৬৩, ১৮৬১, ১৭৭৪, ১৮৩৮।

(২) নীচের বাক্যগুলিতে বন্ধনীর মধ্যে উপযুক্ত শব্দটি রেখে বাকীগুলো ছেঁটে বাদ দিয়ে দাও তো।

(ক) সীসার সঙ্গে (অ্যান্টিমনি / দস্তা নিকেল) মিশিয়ে ছাপার হরফ তৈরি করা হয়।

(খ) গ্রীক পুরাণ মতে জ্যোতির্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী (ইউরিপিডিস/ইউরেনসী/ইউরেনিয়া)।

(গ) ভারতের বৃহত্তম নগরী (কলিকাতা/মাদ্রাজ বোম্বাই)

(খ) পার্লবাক/ভিক্টোর হুগো/টলস্টয় "গুড আর্থ" উপন্যাসটি লিখে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

(ঙ) ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ হচ্ছে (ধবলগিরি/কাঞ্চনজঙ্ঘা/নন্দাদেবী)।

(চ) ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী (আকবর/হুমায়ুন/বাবর) এর নিকট পরাজিত হন।

(ছ) হল্যাণ্ডের রাজধানী (রটারডাম/ভাবলিন/আমস্টারডাম)।

(জ) ইটালী দেশের মুদ্রা (ইয়েন/মার্ক/লিরা)।

(ঝ) গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান (নান্নুর/কেঁদুলী/বোলপুর)।

(ঞ) লঘুসঙ্গীত বাজাবার সবচেয়ে উপযুক্ত যন্ত্র (সারেঙ্গি/বেহালা/গীটার)।

উত্তর

(১) মনীষি	জন্মস্থান	জন্মসাল
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বীরসিংহ	১৮২০
রাজা রামমোহন	রাধানগর	১৭৭৪
বঙ্কিমচন্দ্র	কাঁঠালপাড়া	১৮৩৮
মাইকেল মধুসূদন	সাগরদাঁড়ি	১৮২৪
স্বামীবিবেকানন্দ	সিমলা (কলিঃ)	১৮৬৩
নেতাজী সুভাষচন্দ্র	কটক	১৮৯৭
নজরুল ইসলাম	চরুলিয়া	১৮৯৯
উদয়শঙ্কর	উদয়পুর	১৯০০
পি. সি সরকার	ময়মনসিংহ	১৯১৩

২. (ক) (অ্যান্টিমনি) অ্যান্টিমনি।

(খ) (ইউরেনিয়া) ইউরেনিয়া।

(গ) (কলিকাতা) কলিকাতা।

(ঘ) (পার্লবাক) পার্লবাক।

(ঙ) (কাঞ্চনজঙ্ঘা) কাঞ্চনজঙ্ঘা।

(চ) (বাবর) বাবর।

(ছ) (আমস্টারডাম) আমস্টারডাম।

(জ) (লিরা) লিরা।

(ঝ) (কেঁদুলী) কেঁদুলী।

(ঞ) (গীটার) গীটার।

বিষ্ণু দত্ত

● যাদের লেখা ডাকে এসেছে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগনা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলি—১৪
বাচ্চু মুখার্জ্জী, ২৪ পরগনা
রণসুদাস জিতু, বিষ্টুপুর
সুশীল সিংহ, উগড়া ডিহি
সুব্রত বসাক—গঙ্গারামপুর

* যারা বই বা কিছু জানতে চেয়েছেন
করুণাময় বসু, টাকি, আপনার সৌজন্য
পত্র ডাকে পাঠানো হয়েছে যদি না পেয়ে
থাকেন যে কোন দিন কার্যালয়ে আসুন, পেয়ে
যাবেন।

দুলাল গাঙ্গুলী, বাকসাড়া লেখা পাঠান।
সুজয় রায় চৌধুরী কলি—৯২ আপনার পত্রিকা
পেয়ে খুশি হলাম।
অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী কলি-১০ চিঠি পেয়েছি।
রেবন্ত গোস্বামী-কলিকাতা আপনার চিঠিমতই
কাজ হবে।
বাদল সরকার আকাইপুর ছোট লেখা পাঠাতে
পারেন।

* শব্দ সন্ধান যারা লিখে পাঠিয়েছো
সঞ্জীব রায় চৈতন্যপুর সুখেন বোস, দ্বারভাঙ্গা
চঞ্চল গড়াই, কলি-১১ পম্পা চক্রবর্তী-শিলং

* কথা মালায় যে সব চিঠির সঠিক উত্তর দিয়েছো
বাপী, রাজু সন্তু ও পিংকু—উত্তর পাড়া
সৌমিতা মোদক-গুপ্তিপাড়া
বিকাশ ও প্রহ্লাদ কর্মকার-বাসুবাটি
অবিনাশ চন্দ্র কলি-১০
চৈতালী রায়-দিনাজপুর

* অনুসন্ধানের সঠিক উত্তর
লক্ষ্মীদাস, চন্দ্রকান্ত খাঁড়া, জয়দেব কোলে-রামকৃষ্ণপুর
শ্যামল ভট্টাচার্য-বাগুইহাটি, চৈতন্য পাণ্ডা, চপর-
পদা।

* কাগজকেটে পুতুল তৈরি করে যে যে পাঠিয়েছো।
এখন থেকে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।
বিনতা অধিকারী-বেহালা মনু সান্যাল, কালীবাড়ি
দিল্লী তপাই ঘোষ, লেকটাউন
যাঁরা ধাঁধা মজারখেলা পাঠিয়েছো।
বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী (মেদিনীপুর-১)
শোভেন মুখার্জ্জী, বেলিয়াতোড়, হাঁদুরাম তেওয়ারী,
লক্ষ্ণৌ

ছবির খেলা

রূপালী সাহা

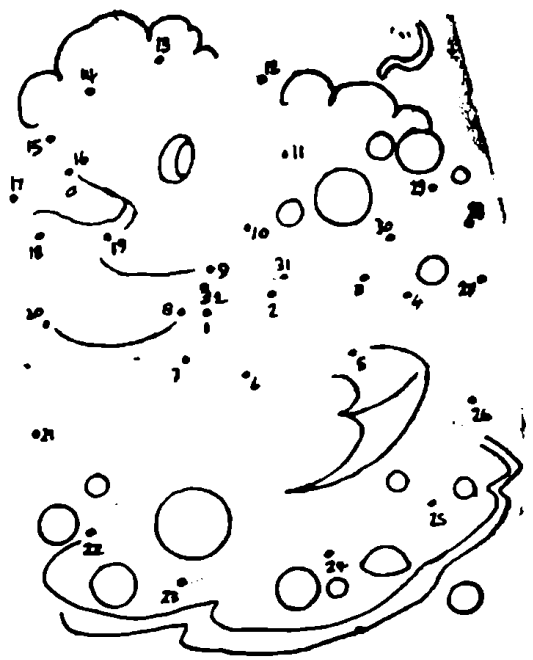

১ থেকে ৩২ পর্যন্ত ফুটকি গুলিকে পরপর জুড়েদিয়ে
ছাখো, ছবিটা কী দাঁড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই
তুমি একটা ছবি এঁকে ফেলেছো, চিঠি দিলে আগামী
সংখ্যায় তোমার নাম চিঠি পত্রে থাকবে।

ছবিতে অনুসন্ধান | মালা সেন

নীচের ছবিটিতে মজার খেলা ! কোন পথে প্রথমে গন্তব্যস্থলে যেতে পারবে ? সেটা ঠিক বলে পাঠিয়েছো ।

সুপ্রিয় দত্ত-কলি-৩২, রাজেন বকসী, মদনপুর চৈতী মজুমদার-রামপুরহাট, দেব দুলাল-গয়লা পাড়া রথ মণ্ডল-কলি ৬৯ মৌসুমী ঘোষ দুর্গাপুর ।

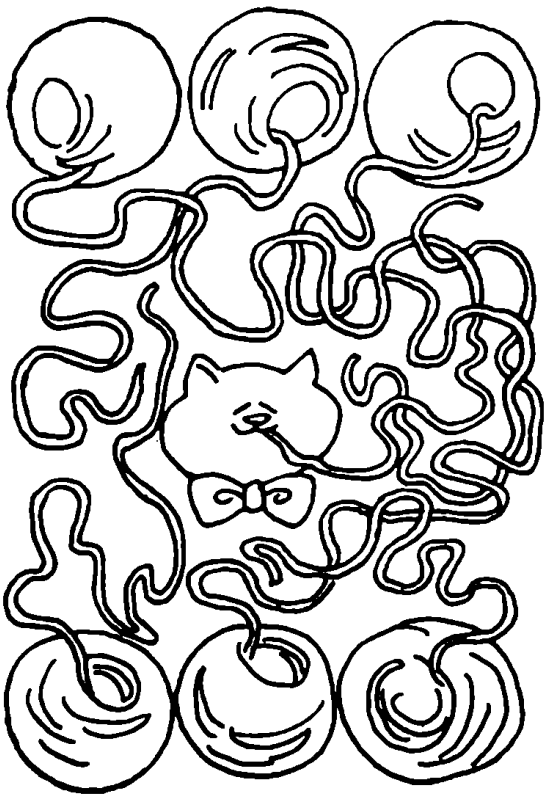

শব্দ-সন্ধান

প্রদীপ কুমার দত্ত

পাশাপাশি : ১ এক দিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন, ৭ ওজনের মাপ, ৮ কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত ফল, ৯ ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ১০ ইংরেজ পুরুষ, ১২ আজমীরের নিকটে হিন্দু তীর্থরূপে যে হ্রদ, ১৪, এর দ্বারা জাহাজের গতিরোধ করা হয়, ১৫, আত্মগোপন করে যে বেড়ায়, ১৭, বাঙালীর প্রধান খাদ্য, ১৮, প্রাচুর্য

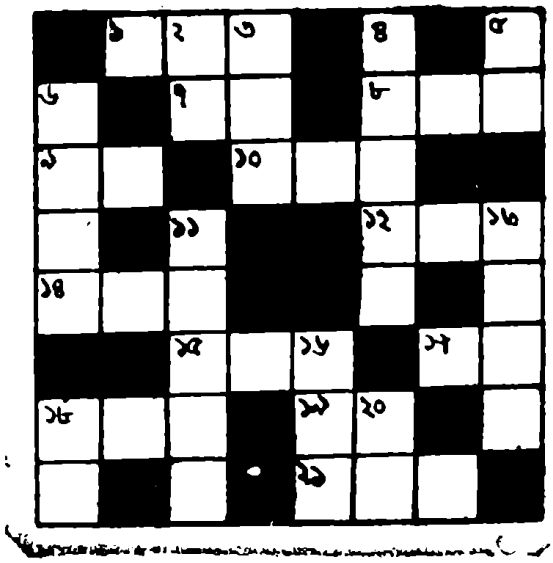

সূচক উচ্চ কোলাহল, ১৯, ভূতলের দিকে নিবদ্ধ, ২১, ভারবাহী পশুর পিঠের গদি ।

উপরনিচ : ২ বেগুনী বর্ণের ক্ষুদ্র ফল, ৩ মেক্সিকোর জাতীয় পতাকায় ব্যবহৃত চিহ্ন, ৪ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান, ৫ রাশিচক্রে উচ্চস্থানে অবস্থিত গ্রহ, ৬ বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারক ১১ উটপেনসিলের আবিষ্কারক, ১৩ পুরাণোক্ত সপ্তপাতালের নিম্নতমটি, ১৬ পুরাকালে বাংলার দস্যুরা তাড়াতাড়ি হাটার জন্য ব্যবহার করত, ১৮ বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থ দর্শন, ২০ অট্টালিকার উচ্চতার বিভাগ ।

** উত্তর—৪২৬ পৃষ্ঠায় ।

দ্বন্দ্ব-মধুর

রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতে 'কোশল' নামে এক রাজ্য ছিল। 'কোশল' রাজ্য বলতে প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য। সেখানকার রাজামশাই ছিলেন যেমন উদার, তেমনি মহৎ। প্রজারা ছিল তাঁর সন্তানের মত। রাজ্য জুড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত।

কোশল রাজ্যের প্রজারা রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন সুমহান রাজা ভূ-ভারতে বিরল। রাজার গুণগান ক্রমশঃ লোকমুখে স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

পাশেই আর একটা রাজ্য। সেই রাজ্যের অধিপতি কাশীরাজ। কোশল রাজের গুণগান একদিন তাঁর কানে পৌছুল। বিচলিত হলেন কাশীরাজ। অবশ্য বিচলিত হবারই কথা। কারণ সকলেই জানে, রাজকীয় মর্যাদায় তিনি কোশল রাজ্যের তুলনায় অনেক বড়। সাহস এবং ক্ষমতায় তার সমকক্ষ রাজা ভারতে নেই বললেই চলে; তাঁর কোন সুনাম নেই। এমনকি তাঁর প্রজারাও কোশল রাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাজ্যজুড়ে কেবল কোশল রাজের গুণকীর্তন। সত্যিই অবাক হবার কথা। অনেকদিন চিন্তা করেও রাজা এর কোন কারণ খুঁজে পাননি।

ইতি পূর্বে কাশীরাজ কয়েকবার কোশল রাজ্য আক্রমণ করেছেন; কিন্তু কোন ফল হয়নি। সেই রাজ্যের প্রজারা বার বার সেই আক্রমণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিছুতেই তারা পরাজয় স্বীকার করেনি। যেমন অটুট তাদের মনোবল, তেমনি অদম্য সাহস। স্বদেশ রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে তারা। শেষে যুদ্ধ জয়ের আশা ছেড়ে দিলেন কাশীরাজ। অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্বরাজ্যে একটি ঘোষণা করলেন, যে-প্রজা ছলে-বলে-কৌশলে কোশল রাজের শিরশ্ছেদ করে সেই মাথা রাজাকে উপহার দিতে পারবে, কাশীরাজ তাকে মহাদানে ভূষিত করবেন।

ঘোষণাটি যথাসময়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। কোশল রাজার কোন শত্রু নেই। সুতরাং লোকেরা কথাটা শুনেও কোন আমল দিলনা। সকলে নিশ্চুপ। কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই। শেষে ঘোষণার কথা লোকেরা একসময় ভুলে গেল। কাশীরাজ আবার চিন্তায় পড়লেন।

এদিকে কাশীরাজের ঘোষণাটি একদিন কোশল রাজার কানে গেল। তাঁর মনেও চিন্তার শেষ নেই। ঘোষণায় সাড়া না পেলে কাশীরাজ হয়ত আবার একদিন 'কোশল' রাজ্য আক্রমণ করবেন।

আবার সেই ধ্বংস কাণ্ড, প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি আর রাজ্য জুড়ে মানুষের হাহাকার। ইতিপূর্বে কাশীরাজের আক্রমণে তাঁর রাজ্যে সেই ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু আর নয়। রাজ্য রক্ষার নামে বার বার প্রজাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। এ শুধু অন্যায় নয়, ঘোরতর পাপ। এরচেয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া অনেক ভাল। রাজা না থাকলেও রাজ্য চলে, এমন নজীর ইতিহাসে আছে। সুতরাং রাজকার্যে কোন অসুবিধা হবে না। প্রজারা একদিন তাদের যোগ্য রাজা খুঁজে নেবে। কথাগুলো চিন্তা করে কোশল-রাজ একদিন সকলের অলক্ষ্যে রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। দক্ষিণ দিকে একটা পথ ধরে তিনি এগিয়ে চললেন। পরনে তাঁর সাধারণ নাগরিকের পোশাক। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনা! রাজাও কাউকে নিজের পরিচয় দেন না।

কয়েকদিন পথ চলার পর ক্লান্ত হয়ে রাজা মশাই একটা গাছের নিচে বসে পড়লেন। সেখানে কিছু-বিশ্রাম নেবার পর লক্ষ্য করলেন, একটা লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বলতে পারেন, কোশলের পথ কোন দিকে?'

রাজা বললেন, 'পূর্বদিকে, আর কিছুটা পথ দূরে।' লোকটা এবার ক্লান্ত সুরে বলল, আর পারছিনা, হৃত সর্বস্ব হয়ে অনেকটা পথ হেঁটে আসছি। এখন শেষ রক্ষা হলে বাঁচি।

অবাক সুরে রাজা তখন প্রশ্ন করলেন—কী রকম? লোকটা বলল, শুনেছি, কোশলরাজ খুব দয়ালু। রাজার জগৎ জোড়া নাম। কিছু সাহায্যের আশায় তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি এক বিপন্ন ব্যবসায়ী। যান গোলযোগে বড় বিপদে পড়েছি।

বণিকের মুখে তার বিপদের কথা শুনে সদাশয় রাজার প্রাণ কেঁদে উঠল! নিজের দুঃখের কাহিনী তখন লোকটিকে খুলি বললেন। সেই কাহিনী শুনে হতাশ বণিক কেবলই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগল। লোকটির হা-হুতাশ রাজাকে আরও করুণ করে তুলল। খানিকক্ষণ চিন্তা করে একটা উপায় বের করলেন তিনি। তারপর লোকটিকে শুনিয়ে বললেন, আপনার এই দুর্দিনে আমি নিজে কোন সাহায্য করতে না পারায় দুঃখিত। তবে আমি একটা উপায় চিন্তা করেছি। সেই মত কাজ করলে, আপনার সাহায্য হতে পারে।

রাজার কথাটা শুসে লোকটা তক্ষুনি সম্মতি জানিয়ে বলল, 'যদি কাজ হয়, তখন আপত্তি কিসের?'

রাজা তখন বললেন, 'আপনার যখন আপত্তি নেই, আমার দিক থেকেও কোন বাধা নেই। এই বলে তিনি কাশীরাজের সেই ঘোষণার কথা সবিস্তারে খুলে বললেন। সমস্ত কাহিনী শুনে বণিক যেন বিপাকে পড়ল। কিন্তু কোন উপায় নেই; কারণ রাজাকে সে আগেই কথা দিয়েছে, তাঁর প্রস্তাবে কোনরকম আপত্তি করবে না। শেষে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বণিক কোশলরাজকে বন্দী করে কাশীরাজের দরবারে উপস্থিত হল।

কাশীরাজ এক অচেনা বণিকের হাতে কোশলরাজকে বন্দী দেখে অবাক হলেন! পরে বণিকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। আত্ম-ত্যাগের এমন ঘটনা আগে কখনও তিনি নিজের চোখে দেখেন নি। কোশলরাজ তাঁর চেয়ে কত মহৎ এবং উদার-হৃদয়, তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। এই সংসারে ত্যাগের চেয়ে বড় কিছু নেই। কোশলরাজ একটি রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও তিনি প্রকৃত ত্যাগের পূজারী। তাই কেবল রাজ সিংহাসনেই নয়, প্রজাদের হৃদয় সিংহাসনেও তাঁর অক্ষয় অধিষ্ঠান।

কাশীরাজ তখন রীতিমত অভিভূত। কোশলরাজের জয়ধ্বনি করে তিনি তাঁকে সসম্মানে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। যাই হোক, বণিক কিন্তু রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কাশীরাজ তাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করে বিপদ মুক্ত করেছিলেন।

বরুণ মজুমদার

তিনটি শিশুর জন্ম

লণ্ডনে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা এক মহিলার একসঙ্গে তিনটি টেস্টটিউব শিশু জন্মেছে। এর মধ্যে দুটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান। ব্রিটেনে একসঙ্গে তিনটি টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম এই প্রথম। বিশ্বের প্রথম একসঙ্গে তিনটি টেস্ট টিউব শিশু গত ১৯৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়াতে জন্মেছিল। ব্রিটেনে জন্মানো ঐ টেস্ট টিউব শিশু তিনটি এবং তাঁদের মা এখন ভালই আছেন। এই শিশু তিনটি জন্মেছে গত ২১শে জানুআরি। এদের ওজন ৪ পাউণ্ড ৫ আউন্স থেকে ৫ পাউণ্ড ১০ আউন্সের মধ্যে। সিজারিয়ান অপারেশন করে এদের ভূমিষ্ঠ করা হয়। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস অ্যান।

কম জনসংখ্যার রেকর্ড

গত বছর সুইডেনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত কম ছিল যে সেটা একটা রেকর্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৯৮৩ সালে সুইডেনে নতুন শিশু জন্মেছে মাত্র ১ হাজার ২ শোর কিছু বেশী। একদিকে জন্মহার কমে যাওয়া এবং অপর দিকে মৃত্যুর হার একই থাকায় ১৯৮৩ সালে সুইডেনে নীট জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ৮শো। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, যদি সেখানে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তবে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সেখানে বয়স্ক লোকের সংখ্যা ছোটদের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে।

ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের মামলা

হনুলুলুতে একজন মা তার নিজের ছেলের বিরুদ্ধে তার পোষা কুকুরকে জোর করে অপহরণ করার অভিযোগ তুলে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন। মামলাতে জানা গেছে যে, ছেলেটি দু'বছর আগে ঐ কুকুরটিকে এনে মাকে দেয়। তারপর মায়ের অনুমতি ছাড়াই কুকুরটাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। এতেই মা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মায়ের পক্ষ সমর্থনকারী অ্যাটর্নি বলেছেন যে যদিও দুহাজার টাকা দিয়ে একই রকমের একটা কুকুর পাওয়া যেতে পারে, তবুও তাঁর মক্কেল ৫ লক্ষ টাকা দাবী করেছেন। কারণ কুকুরটার প্রতি যে ভালবাসা জন্মেছিল তা অন্য কিছুতেই পূরণ করা যাবে না।

রূপের কি দাম

লণ্ডনের এক ষোড়শী স্কুল ছাত্রী পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হলেন চিকিৎসার জন্য। সেখানে কিছুদিন থেকে তাঁর দেহের ওজন ৩০ কিলো বেড়ে গেলো। এর জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ পেলেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মতো। বিচারপতি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বলেছেন যে, ঐ ষোড়শী ক্ষতিপূরণ বাবদ এই টাকা পাবার অধিকারী কারণ দেহের অতিরিক্ত ওজনের দরুণ তার সৌন্দর্য আগের চেয়ে ম্লান হয়েছে। সত্যি রূপের কি দাম বলুন তো ?

মারমুখী হবার কারণ

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, যে-সমস্ত শিশু মানসিক অসাম্য থেকে মুক্ত তাদের তুলনায় যে-সমস্ত শিশু আবেগ প্রবণতার সমস্যায় ভুগছে তারা বেশী

মারমুখী হয়ে থাকে। বিভিন্ন অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের আচরণ সম্পর্কে সমীক্ষা করে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতেই একথা জানা গেছে। লক্ষ্ণৌর কিং জর্জেস মেডিকেল কলেজের তিনজন ডাক্তার যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়ে সম্প্রতি রাঁচিতে ইণ্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে এই সম্পর্কিত নথিপত্র পেশ করেছেন। সমীক্ষায় প্রকাশ যে, অনাথ আশ্রমের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় পীড়িত ৬৯·৪ শতাংশ ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রায় ৩৯ শতাংশের মধ্যে মারমুখী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে! বয়স, স্ত্রী পুরুষ বা অনাথ আশ্রমে থাকার মেয়েদের পার্থক্যের দরুন এইসব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উগ্রতার তারতম্যের ঘটনা চোখে পড়েনি।

বিমান দ্রুত চলার জন্য

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বিমানের গায়ে ছোট ছোট আঁচড় কেটে দিলে তা বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ডলার জ্বালানির সাশ্রয় করতে পারে। দ্রুত সাঁতারে সক্ষম হাঙ্গরের চামড়া পরীক্ষা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, খালি চোখে দেখা যায় এমন ঘন ঘন দাগ যদি জেট বিমানের গায়ে থাকে তবে তা দশ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানির সাশ্রয় করতে পারে। এতে কম জ্বালানিতে বিমান দ্রুত বেশীদূর যেতে পারে। বিমানের ধাতু নির্মিত গায়ে এই ধরনের হিজি বিজি দাগ কেটে দেওয়া যেতে পারে বা এবড়ো খেবড়ো অসমান টেপও বিমানের গায়ে সেটে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে বিমানের গাটা হাঙরের গায়ের মত অসমান হয়ে যাবে, এতে বিমান বাতাসের বিরুদ্ধে দ্রুত গতিতে ছুটতে পারবে। এতে বিমানে জ্বালানির খরচ বাঁচবে বছরে ৩০ কোটি ডলারের মত। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিমান, জাহাজ এবং সাবমেরিনের গা হাঙরের গায়ের মত করে এ সবের গতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা থেকেই এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা বিমান, জাহাজ ও সাবমেরিনের কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য প্রাণীজগতের দিকে ঝুঁকেছেন।

শব্দ সন্ধানের উত্তর : (৪২২ পৃষ্ঠার)

পাশাপাশি : ১ নিজাম, ৭ মণ, ৮ বিড়ঙ্গ, ৯ লক্ষ্মী, ১০ সাহেব, ১২ পুষ্কর, ১৪ নঙ্গর, ১৫ ফেরার, ১৭ ভাত, ১৮ হররা, ১৯ নত, ২১ পালান।

উপরনিচ : ২ জাম, ৩ মনসা, ৪ হবিবপুর, ৫ তুঙ্গ, ৬ ফুলটন, ১১ কারকেরাস, ১৩ রসাতল, ১৬ রণপা, ১৮ হজ্জ, ২০ তলা।

শব্দ মালা | প্রদীপ কুমার দত্ত

গতবারের শব্দমালা কিছুটা ভিন্ন ধরনের তাইনা আর প্রথমেই মনে রেখে পাশাপাশি দুটো ছকে মালার মতো করে সাজিয়ে পাঠিয়েছো।

উত্তর : (১) নং—অ্যামিবা, সজারু, বাবুই, চড়াই, ময়না।

উত্তর : (২) নং—বাদুড়, বিড়াল, বকনা, জিরাফ, সারস।

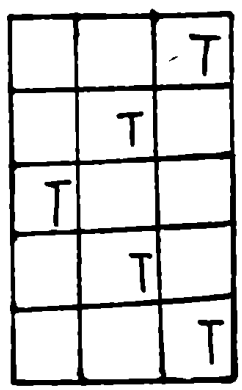

এক নং

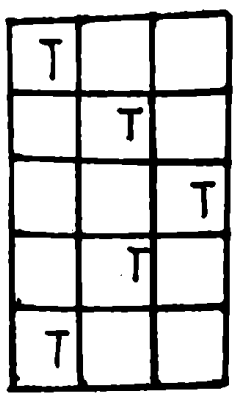

দুই নং

মহাকাশে বিপদ সংকেত / অমিতাভ সেন

মহাকাশে রাসেল যাচ্ছে! শত্রুযান পিছনে এসে পড়েছে! ছোট্ট ছেঁদার মধ্যে দিয়েই ঢুকে পড়তে হবে! ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হলেও একটু ভয়ের!

ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত ! একটা সংকেত পাচ্ছি ! অদ্ভুত স্পন্দনও পাচ্ছি ! দেখি এগিয়ে-সত্যই তো একজন কে শুয়ে আছে ! রাসেলকে ইসারায় ডাকছে ! কাছে এসো !

শত্রুযানে রাসেল ঢুকেছে! তার সমস্ত ছবি সেনাধক্ষ দেখছে! অশরীরী লোকটা রাসকে বলে তুমি ভেব না তোমার সঙ্গে আমি আছি! দলের নেতা যা করণীয় করে নিয়ে তোমায় সাহায্য করবে।

মহাকাশে আতঙ্ক....!

রাস অশরীরীর বার্তা পায়। রাক্ষস এ্যাটিলা ও সেনাধক্ষ্যের দৌরাত্মে আমাদের প্রাণীরা ভেসে বেড়াচ্ছে ছন্নছাড়া হয়ে। রাসের চেতনা কোষে অশরীরী বলে তোমাকে ওদের রক্ষা করতেই হবে।

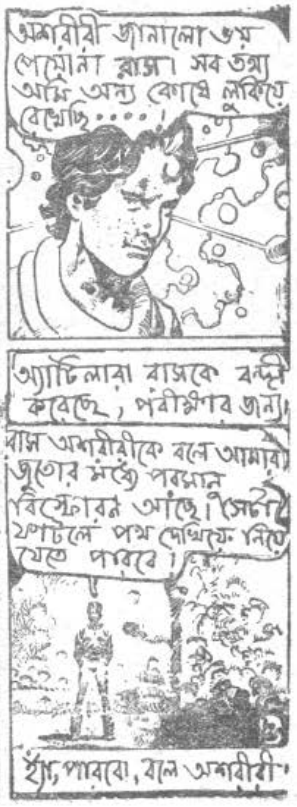

রাস অশরীরীর কাছে পথের হদিশ পায়। দেখ সামনে বেরিয়ে গিয়ে প্রহরীর মুখোমুখি। রাসের আচমকা একটি ঘুসিতে কাত হয়ে রক্ষী নিচে পড়ে। রাসও ঐ পথে একসঙ্গে লাফ দেয়।

নিচে এসে হতবাক! রক্ষীর দল। রাস ধরা দিল! রাস ভাবে এদের ধ্বংস করলে সবাই মরবে! অশরীরী 'রাস'কে নির্দেশ দেয় মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগিও কেউ তোমায় আটকাবে না!

শত্রুযানে রাসেল ঢুকেছে। তার সমস্ত ছবি সেনাধক্ষ দেখছে। অশরীরী লোকটা রাসকে বলে তুমি ভেব না তোমার সঙ্গে আমি আছি। দলের নেতা যা করণীয় করে নিয়ে তোমায় সাহায্য করবে।

রাস পথের খোঁজ পেয়ে এগোয় ! দেখলো রাক্ষস চেহারার ফ্রিজের সঙ্গে এ্যাটিলাও এগিয়ে আসছে ! রাস বললো দেখো ফ্রিজ তোমার কাছে কিন্তু আমার পরাজয় হবে না ! বাঁচতে চাও তুমি সরে পড় !

রাস বার বার বলে সরে দাঁড়াও না হলে তোমার দেহের কিছুই থাকবে না। ফ্রিজ পালাও এ্যাটিলা তোমার দিকে একটা বিস্ফোরণ পাঠালাম—কেবল তুমিই ধ্বংস হবে! দেখ, চেতনার বার্তা এসেছে! কাজ আমার শেষ হয়েছে, আমায় এখন ফিরতেই হবে।

সায়েন্সফিকসান
ডিটেকটিভ
রহস্য
তদন্ত
কমিকস
রোমাঞ্চ
অলৌকিক
ও
ভৌতিক
কাহিনীর

শুকতারা

আগামী সংখ্যায় থাকবে...

নামী লেখকদের নিয়ে লেখা

২টি উপন্যাস লিখছেন ২টি বড় গল্প লিখছেন

২টি বি[illegible]না লিখছেন

এ ছাড়া আকর্ষণীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

সঙ্গে

অজস্র রঙীন ছবি

দুরন্ত 'তপাই'কে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন ঃ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

এছাড়া আগামী সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠার একটি কমিকস সম্পূর্ণ পাবে

তোমার কাছের স্টলে বলে রাখ

সংখ্যাটি খুব শীঘ্রই বেরুবে

২৭, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

* শুভতারা * পঞ্চম সংখ্যা * ১৩৯১ * ২·৫০ টাকা
Rs. 2·50 * June '84 * Regd. W.B.CC 406 * A.H.W.

★ WIREWOUND RESISTOR upto 1000 watts
★ INDUSTRIAL RESISTOR upto 3000 watts
★ POTENTIOMETER 1 watts upto 5 K.
★ POTENTIOMETER 3 watts upto 33 K.
★ TORODIAL POWER RHEOSTATS upto 1000 watts
★ SLIDING RHEOSTATS upto 50 Amps
★ NON-INDUCTIVE RESISTORS upto 1000 watts
★ FERRULE TYPE RESISTORS upto 300 watts
★ AXIAL LEAD RESISTORS upto 12 watts

TYPE TRC

AV

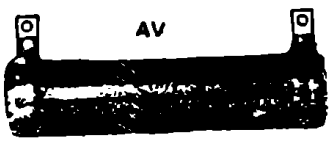

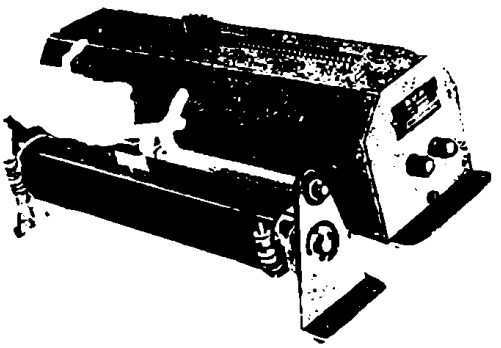

AVA

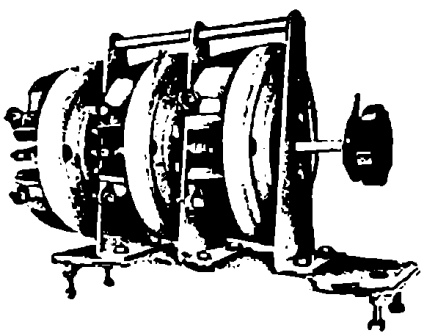

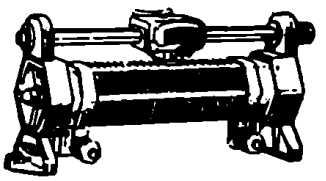

C R C

CALCUTTA RESISTANCE COMPANY

27, BIPIN BEHARI GANGULY STREET,
POST BOX NO. 7803
CALCUTTA-700012

Gram : WIREWINDER

Phone : 26-7970